চাঁদমালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা

বহুদিন আগে 'বহুবিচিত্র' নামে আমার একটি বই বেরিয়ে ছিল। তারই খানিকটা বর্জন ক'রে এবং নূতন অংশ সংযোজন ক'রে বর্তমান বইটি বেরোল। সে বইয়ের সঙ্গে এর অনেকটাই রূপান্তর ঘটেছে বলে সাহস ক'রে নামান্তরও করেছি। আশাকরি পাঠকরা ক্ষমা করবেন। ইতি—লেখক

চাঁদমালা

মণি বাবুর মৃত্যুতে তাঁর ছাত্রের দল এবং সহকর্ম্মী অধ্যাপকরা, সকলেই একটু বিশেষ শোকাভিভূত হলেন। তার কারণও ছিল। কারণ—মণিবাবু ঠিক সাধারণ অধ্যক্ষ ছিলেন না—আরও পাঁচটা কলেজে যেমন অধ্যক্ষরা হন, কারুর কাছে প্রিয়, কারুর কাছে অবজ্ঞেয়—তা-ও ছিলেন না। তাঁর ছাত্র এবং সহকর্ম্মীরা তাঁকে একটা বিশেষ সম্ভ্রম ও প্রীতির চোখে দেখতেন। আর তার যথেষ্ট কারণও ছিল।

শুধু জীবিতকালেই যে তিনি অসাধারণ ছিলেন, তাই নয়—মৃত্যুটাও তাঁর যেন জীবনের মতই একটু বিশিষ্ট, একটু পৃথক। সেটা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে বেশ একটু মানানসই। কলেজ আর কাজ—এ ছাড়া জীবনে তিনি কোন দিকে তাকান নি কোন দিন। সেই কলেজেই কাজ করতে করতে অকস্মাৎ নিজের টেবিলের উপর এলিয়ে পড়লেন, একটা অস্ফুট শব্দ মাত্র উঠল, 'উঃ'—তার পরই স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর দক্ষিণ হাতটি প্রসারিত হয়েছিল একটা কাগজ-চাপা কাচের দিকে, মধ্যপথে সেটি থেমে পড়ে গেল—পড়ে গেল রামকৃষ্ণের একখানা বাঁধানো ছবির নিচেই। যেন ছবিতে ঠেকেই থামল সেটা।

তাঁর সঙ্গে সহকারী-অধ্যক্ষ পুলিন বাবু বসে কথা কইছিলেন—তিনি ব্যস্ত হয়ে মাথায় জল দিতে লাগলেন, চেঁচামেচিতে অপর লোক-জন ছুটে এল—ডাক্তারও একজন হাজির ছিলেন কলেজেই—কিন্তু দেখা গেল যে এত ব্যস্ত

নিয়েছেন। যে ধরণের মৃত্যু তাঁর মতে মানুষ মাত্রেরই কাম্য—বীরের মৃত্যু—সেই মৃত্যুই তাঁর ঠাকুর তাঁকে দিয়েছেন।

কথাটা ছাত্রদের কাছে তিনি বার-বারই বলতেন, "সেকালটা ছিল বীরত্বের যুগ, সিভ্যালরির যুগ। সেকালে সবাই চাইত রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু—যেন যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ যায়। একালে সে সব কিছুই নেই। লড়াই হয়, তাও নিরস্ত্র অসহায় লোক মেরে। সুতরাং একালে বীরের মৃত্যু হল কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে করতে মৃত্যু। ঠাকুরের কাছে কোন দিনই কিছু চাই নি, কিন্তু যদি চাইতে হয় ত' এইটিই চাইব—যেন ভুগে আর ভুগিয়ে না মরি।'

তাঁর এই একটি অপ্রার্থিত প্রার্থনা বোধ করি তাঁর ঠাকুরের কাছে যথাসময়েই পৌঁছেছিল। নইলে যাঁর ষাট বছর বয়সে রিটায়ার করবার কথা—কলেজের গভার্ণিং বডি বলতে গেলে হাতে-পায়ে ধরে দুবছরের জন্য এক্সটেনশ্যান নিতে তাঁকে রাজী করবেন কেন?···সে সময়ও ত আর মাত্র তিন মাস পরে শেষ হয়ে যেত! বর্ত্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর দল বিপুল চাঁদা তুলে ত তৈরীই হচ্ছিল তাঁকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে, সে সুযোগও তাদের দিলেন না তিনি।

অবশ্য—এই মৃত্যু না হলে তিনি বিপন্নও হতেন বৈ কি!

মণি বাবু অকৃতদার ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে একটা বাড়ীতে একা বাস করেছেন। কেন তিনি বিবাহ করেন নি, তা কেউ জানেন না। তাঁর মার মৃত্যু হয় শৈশবে, বাবাই তাঁকে মানুষ করেছিলেন—একাধারে মা ও বাবা ছিলেন তিনিই। ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলতেন যে ওঁর বাবা বৃদ্ধ বয়সে বড় বেশী খিট্‌খিটে হয়ে পড়েছিলেন—পাছে তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর বনিবনা না হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ বাপকে ছেড়ে চলে যেতে হয়—এই ভয়েই মণি বাবু প্রথমটা বিবাহ করেন নি। ভেবেছিলেন বাবা মারা গেলেই তিনি বিবাহ করবেন। সে ঘটনাটা ঘটতে এত দীর্ঘ কাল সময় নেবে, হয়ত তা তিনি ভাবেন নি। সে ভদ্রলোক ছিয়াশি বছর পর্যন্ত বেঁচে ওঁর সব পরিকল্পনা গোলমাল করে দিয়ে

গেলেন। কেন না, তখন মণি বাবুরও চল্লিশ পেরিয়েছে। বেলুড় মঠে দীক্ষা নিয়েছেন তিনি—পূজা-পাঠে মন দিয়েছেন। আর তখন নূতন করে গহনা-শাড়ী-সর্ব্বস্ব একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরিচয় করবার কথা ভাবতে পারলেন না। ... মরবার পর ঠাকুরঘরে রামকৃষ্ণের ছবির পাশে বাবারও একটি ছবি বসিয়ে ...ছ পূজা এবং আরতি করতে শুরু করলেন। বিবাহ করা আর হয়ে না।

শুধু তাই নয়। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অবস্থাপন্ন অকৃতদার আত্মীয়ের ভার নেবার মত বহু স্ত্রীলোক ছিল, তাঁরা আত্মীয়তা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বৃদ্ধের ক্ষুরধার রসনার ভয়ে এত কাল এ দিকে তাঁরা ঘেঁসেন নি! কিন্তু মণি বাবু বেশ একটু রূঢ় ভাবেই তাদের অযাচিত আত্মীয়তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বাবাকে যারা ভাল চোখে দেখে নি—তাদের তিনিও ভাল চোখে দেখতে রাজী নন। একটি ঠিকে বুড়ী ঝি এসে দু'বেলা কাজকর্ম্ম করে দিয়ে যেত। অত বড় বাড়ীটায় তিনি সম্পূর্ণ একাই বাস করতেন। নিজে রেঁধে খেতেন—অর্দ্ধেক দিন ওটা যে হয়ে উঠত না, তা বলাই বাহুল্য—ফল আর সন্দেশের ওপর দিয়ে সে ব্যাপারটা সারতে হত। রান্না করলেও এক বেলার বেশী নয়—এবং সেটাতে এক ঘণ্টার বেশী সময় দিতেন না। বাকী সময়টা কাটত শুধু পড়াশুনো করে। বই আর বই—বাবার রেখে-যাওয়া টাকা এবং নিজের আয়—ক্রমশঃ ক্রমশঃ সবই প্রায় বইতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল—খালি বাড়ীর ফাঁকা ঘরগুলি ভরে গিয়েছিল। বই, কলেজের কাজ এবং ছাত্র, এই নিয়েই তাঁর দিন-রাতের ফাঁকগুলি নিরন্ধ্র নিরবসরে পরিণত হয়েছিল।

আত্মীয়দের তিনি বাড়ীতে ঢুকতে দিতেন না, কিন্তু ভাল—অর্থাৎ জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদের প্রায়ই বাড়ীতে নিয়ে যেতেন। কোন দিন তিনি তাদের চা-কফি করে খাওয়াতেন, কোন দিন তারাই তৈরী করত। সন্দেশ এবং ফল তাদের জন্যও সাজানো থাকত—তাদের পড়িয়ে, তাদের সঙ্গে গল্প করে নিঃসঙ্গতা দূর করতেন খানিকটা। ছোট-খাটো অসুখে-বিসুখে তারাই এসে দেখাশুনা করত। এত কালের মধ্যে একবারই মাত্র বড় অসুখ করেছিল,

টেলিফোন করে নার্স আনিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সের কথা কেউ কেউ স্মরণ করিয়ে যে দিত না, তা নয়—তিনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে জবাব দিতেন, "ঠাকুর আছেন, সে ভাবনা তিনিই ভাববেন।"

সে বিশ্বাস তাঁর বৃথা হয় নি—ঠাকুরই ভাবলেন শেষ পর্য্যন্ত!

মণি বাবু এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। এম-এ পাশ করে নিজের কলেজে এলেন লেকচারার হয়ে। প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পাস করেছিলেন। অনেক ভাল কাজ পেতে পারতেন—কিন্তু তিনি গেলেন না। পরে যখন অধ্যাপক হিসাবে যথেষ্ট নাম হল, তখনও অন্যান্য কলেজ থেকে বিস্তর লোভনীয় প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হন নি। নিজের এই কলেজটির ওপর অদ্ভুত মায়া ছিল তাঁর। অবশ্য কলেজও তাঁর এই স্বার্থত্যাগ ভোলে নি—শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে অধ্যক্ষ করে দিয়ে কথঞ্চিত ঋণ শোধ করেছিল।

মণি বাবুর ব্যক্তিগত জীবন যতই বিচিত্র হোক—বাইরের ব্যবহারিক জীবন খুব সাধারণ ছিল। গম্ভীর হ'লেও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। ছাত্রদের, বিশেষতঃ যারা সত্যিই লেখাপড়া শিখতে চায়—তাদের তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, আত্মীয় ও শিক্ষক। তাদের যত কিছু অভ ভিযোগের তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল শ্রোতা। কর্ম্মচারী ও সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধেও তাঁর বিবেচনার অন্ত ছিল না।

কেবল একটি বিষয়ে তিনি সত্যই একটু অসাধারণ ছিলেন। মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী হুঁশিয়ার ছিলেন। প্রাণপণে চিরকাল তাদের এড়িয়ে চলতেন। কখনও কোন দিন কেউ তাঁকে মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে দেখে নি। তিনি যখন ক্লাস নিতেন, তখনও ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে পড়াতেন না কোন সময়। কোন দিন কোন মেয়েকে তিনি পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি, অথচ ছাত্রদের হামেশাই করতেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে বা কলেজের লন-এ কোন ছাত্রী নমস্কার করলে, হাতটা কপালে ঠেকিয়ে প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গী মাত্র করেই

দ্রুত চলে যেতেন সেখান থেকে। তবু সেই অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁর সুগৌর ললাটে যেন কে আবির মাখিয়ে দিত—এত লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করতেন তিনি।

অধ্যক্ষ হবার সময়ও এই জন্যেই তাঁর আপত্তি ছিল সব চেয়ে বেশী। তাঁর এক প্রবীণ অধ্যাপক এক রকম 'আদেশ' না করলে তিনি ও পদ হয়ত কিছুতেই নিতেন না। তাও যতটা সম্ভব ছাত্রীদের 'স্লিপ' তিনি সহকারী-অধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। দৈবাৎ কোন ছাত্রী তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে কোন আবেদন জানালে কথার উত্তর দিতেন ঠিকই, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতেন না।...তাঁর সহকর্ম্মীরা আড়ালে বলত, 'প্রতিক্রিয়া'। অপেক্ষাকৃত প্রবীণরা বলতেন, 'অভ্যাস'। আত্মরক্ষার জন্যই একদা ওটা প্রয়োজন হয়েছিল, এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।...নইলে যে রূপ ওঁর ছিল, প্রথম বয়সে মেয়েদের হাত থেকে বাঁচা কঠিন হত ওঁর!

এ-হেন মণি বাবুর মৃত্যুর পর এ কী দেখা গেল!

তখন অবশ্য মাসখানেক কেটে গেছে। কর্তৃপক্ষ নূতন অধ্যক্ষ নিয়োগ করেছেন। তিনি এসে কাজে যোগও দিয়েছেন, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই—তাঁকে কার্য্যভার বুঝিয়ে দেবে কে? অগত্যা তিনি নিজেই বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। সহকারী-অধ্যক্ষ এবং কেরাণী একজনকে ডেকে একে একে অধ্যক্ষের ডেস্কের টানাগুলো, আলমারী ও লোহার সিন্দুকের কাগজপত্র, টাকাকড়ি দেখে-শুনে তালিকা করে নিলেন। মণি বাবু খুব নিয়মানুগ মানুষ ছিলেন, কাগজপত্র সব ঠিকঠাকই ছিল, কিছুই বুঝতে অসুবিধা হল না। কিন্তু দেখা গেল, আলমারী ও সিন্দুকে বহু দিনের এমন বহু জিনিষ জমে আছে, যা আর তুলে রাখবার কোন দরকার নেই। মণি বাবুর আগে যাঁরা অধ্যক্ষ ছিলেন—তাঁদের আমল থেকে জমে আছে কিছু কিছু—মণি বাবুর নিজের আমলেও জমেছে। তিন দিন ধরে ওঁরা বসে বসে সেগুলো দেখে দেখে কতক বাতিল করলেন, কতক গুছিয়ে আবার তুলে রাখলেন।

পরে আলমারী শেষ করে সিন্দুকে হাত দিলেন ওঁরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে। কারণ টাকাকড়ি, কোম্পানীর কাগজ, দলিল, ন্যাশানাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র—এ ছাড়া সেখানে কিছু থাকবার কথা নয়। কিছু ছিলও না—যদি না কাগজপত্রের অন্তরালে একেবারে এক কোণে রুমালমোড়া ঐ পদার্থটিকে বিশেষ 'কিছু' বলে আপনারা স্বীকার করেন!

সাংঘাতিক জিনিস যে!

একটি নকল ভেলভেটে মোড়া কেস-এ এক জোড়া চকচকে নূতন সোনার দুল।

অব্যবহৃত—আনকোরা নূতন।

কী সর্ব্বনাশ!

ঘরে তখন যে তিন জন উপস্থিত ছিলেন তাঁরা পাথরের মত স্থির হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। নূতন অধ্যক্ষ যিনি এসেছেন তিনি বাইরের লোক—তবু এই কদিন প্রাক্তন-অধ্যক্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছেন। সুতরাং তাঁরও কিছু বিস্ময়বোধ হতে পারে বৈ কি!

তবু তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, "হয়ত মণি বাবুর আগে থাকতেই আছে এখানে। রাখাল বাবু কিম্বা বিজয় বাবুর আমলের জিনিস হয়ত"—

পুলিন বাবু অভিভূতের মত ঘাড় নাড়লেন, "উঁহু! এই রুমাল আমি চিনি! একেবারে ডজন দরে কিনতেন মণি বাবু, তা ছাড়া ধোপার এই মার্কাটাও আমার পরিচিত!"

আবারও কিছুক্ষণ সেই অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর অধ্যক্ষ বললেন, "থাক ওটা এখানেই। পরে যদি কিছু হয়ত—নইলে না হয় ওঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

পুলিন বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "না না। সে মিছিমিছি একটা স্ক্যাণ্ডাল, বরং কোন চ্যারিটিতে দিলেই চলবে।"

কথাটা চাপা রইল না। কলেজে আলোচনার ঝড় বয়ে গেল, একটা

হাসাহাসি ঠাট্টা-বিদ্রূপ—নানা জল্পনা-কল্পনা। কী করে ব্যাপারটি ছাত্র-ছাত্রী মহলে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। মণি বাবুকে যাঁরা ভাল করে চিনতেন তাঁরা একটু ব্যথিত হলেন। দেবতা সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এলে ভক্তের যেমন ব্যথা লাগে—তেমনিই। তাঁরা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন। ক্রমে ক্রমে চাপা পড়ে গেলও। দুল-জোড়াটা আবার তেমনি ভেলভেটের কেসে রুমাল-জড়ানো অবস্থায় কাগজপত্রের আড়ালে একটি বিস্মৃত কোণে পড়ে রইল। তার কথা নূতন অধ্যক্ষ বা পুলিন বাবু কারুরই মনে রইল না। শুধু দেখা গেল, ওর কথাটা ভোলেন নি কেরাণী বাবুটি। বছরখানেক পরে তাঁর মেয়ের বিবাহের সময় অনেক আমতা আমতা করে কথাটা পেড়েই ফেললেন। তাঁরা ত চ্যারিটিতেই দিতে চেয়েছিলেন—কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে উপযুক্ত চ্যারিটির ক্ষেত্র আর কী হতে পারে?

অধ্যক্ষও কথাটার যথার্থ্য বুঝে দুল-জোড়াটা বার করে দিলেন। ভাগ্যিস, এর পরের অধ্যক্ষ এলে হয়ত বা তাঁকেই—ভাবতেও গায়ে ঘাম দেখা দেয়!

অর্থাৎ রহস্যটা অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল!

এ রহস্য পরিষ্কার করতে পারত জগতে একটি মাত্র মানুষ। কিন্তু তার কথা কারুর মনে আসে নি, আসা সম্ভব নয়। তার কাছেও এ কাহিনী পৌঁছায় নি নিশ্চয়। এমন কি সুদূর এলাহাবাদে বসে খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে, তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছ' পয়েন্ট টাইপে ছাপা মণি বাবুর মৃত্যুর সংবাদটাও তার চোখে পড়েছিল কি না সন্দেহ!

সে মানুষটি হল নন্দিতা।

অনেক দিন আগে এই কলেজেরই ছাত্রী ছিল সে। মণি বাবু অধ্যক্ষ হওয়ার সামান্য কিছু দিন পরেই সে ভর্ত্তি হয় এখানে।

তখন মণি বাবুই ছিলেন এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সব চেয়ে আলোচনার বস্তু, বিশেষ করে ছাত্রীদের কাছে। কারণ তাঁর অনন্যসাধারণ রূপে তখনও পুরোপুরি বার্দ্ধক্যের কালিমা লাগে নি, তখনও তাঁর সে কান্তির

কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। এমন রূপবান, এমন বিদ্বান (অবস্থাপন্নও বটে) লোক বিবাহ করল না—এটা মেয়েদের অনেকের কাছেই অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। তাই জল্পনা-কল্পনা আলোচনার অন্ত ছিল না ওঁকে কেন্দ্র করে।

নন্দিতা ছিল ধনিকন্যা। আদরে আবদারে প্রতিপালিত, তাইতেই অভ্যস্ত। পরের ওপর খানিকটা জুলুম চালানো সে জন্মগত অধিকার বলেই মনে করে। স্বাস্থ্যবতী, প্রাণচঞ্চল মেয়ে, দুষ্টুমীতে ভরা চোখ দু'টি—সে চোখকে ম্লান হ'তে দিতে কারুরই ইচ্ছা করে না। সুতরাং কলেজে আসার কিছু দিন পরেই সে সমস্ত অধ্যাপকের স্নেহের এবং সহপাঠিনীদের ঈর্ষার পাত্রী হয়ে উঠল। কিছুটা নেতৃস্থানীয়াও।

মণি বাবুর কথা ত ওঠেই মধ্যে মধ্যে। হঠাৎ সেদিন নন্দিতা বলে বসল, "ও, অমন সাধু পুরুষ আমি ঢের দেখেছি। এক দিনে জব্দ করে দিতে পারি ওঁকে। হুঃ!"

একমাত্র ওঁরই প্রশ্রয় সে পায় নি এখানে এসে। কিছু ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল বৈ কি নন্দিতার!

মণিকা বিদ্রূপের সুরে বলল, "সারা জীবন ধরে বড়লোক বাবার বাড়ীতে মোসাহেবই দেখেছিস্ নন্দিতা, মানুষ বুঝি তোর চোখে পড়ে নি?"

রীতা বললে, "এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।"

শোভা বললে, "সবাইকে তোমাদের প্রজা বলে ভাব কেন নন্দিতা?"

আগুন হয়ে উঠল নন্দিতা। বললে, "অত কারুর চ্যাটাং-চ্যাটাং কথার ধার ধারি না। কাজ করে দেখিয়ে দেব। বাজী রাখছি।"

"কি বাজী রাখবি? আর কি-ই বা করবি?"

নন্দিতা চির দিনই ঝোঁকের মাথায় কাজ করে এসেছে। আজও সে বিশেষ কিছু না ভেবেই বললে, "ঐ মণি বাবুর কাছ থেকে আমি একজোড়া কানের দুল আদায় করব—আজ থেকে এক মাসের মধ্যে। যদি না পারি ত' তোদের সকলের সামনে নাকে খৎ দেব। যদি পারি ত' তোরা দিবি। ছাখ—রাজি?"

সকলেই তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। প্রথমত এত বড় একটা কৌতুক ও কৌতূহলের ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ—মণি বাবুকে কে না চেনে। নন্দিতাটাই মরবে নাকে খৎ দিয়ে।

মণিকা বললে, "আমি কিন্তু ছাড়ব না ভাই নন্দিতা। তখন যে ওজর করবে তা হবে না—"

"তেমন বাপের মেয়ে আমি নই। হারলে সে পরাজয় স্বীকার করবার মত মরাল কারেজ আমার আছে!"

এরপর দিন-দুই নন্দিতা কিছুই করল না। বোধ হয় মতলবই আঁটল শুধু মনে মনে। অথবা এদের দৃষ্টিটা এড়াতে চাইল।

তারপর একদিন হঠাৎ দুপুর বেলা অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে পড়ল সে। ওঁর ঘরের বাইরে যে বেয়ারা থাকে সে একটা জরুরী কাজ নিয়ে গেছে কোথায়—সেই অবসরে পর্দা সরিয়ে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়ে নন্দিতা প্রশ্ন করলে, "আসব স্যার?"

কণ্ঠস্বরেই মণি বাবু লাল হয়ে উঠেছিলেন। সেদিকে না তাকিয়ে বেশ কঠিন কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, "কী চাই?"

"একটা প্রশ্ন করতে এসেছি স্যার"—

"আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন।"

"বেশ, কখন আসব বলুন?"

"ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের কাছে যাও না"—

"না স্যার। আপনার কাছে ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে একটা।"

অগত্যা মুখ তুলতে হল। বিরক্তিতে মণি বাবুর ললাটে বিরাট একটি ভ্রূকুটি ঘনীভূত হয়েছে! তিনি ওপাশের দেওয়ালটার দিকে ফিরে বললেন, "বেশ এখনই বলো কী বক্তব্য। কিন্তু খুব সংক্ষেপে।"

"আপনি ত বেলুড় মঠের শিষ্য। আচ্ছা ওঁদের আশ্রমে সন্ন্যাসিনী রাখার নিয়ম নেই কেন?"

আর যাই হোক্—এ প্রশ্নের জন্য ঠিক মণি বাবু প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি এবার ওর দিকে তাকালেন।

বিরক্ত কণ্ঠেই বললেন, "এসব অবান্তর প্রশ্নের কী দরকার তা ত' বুঝি না?"

"আপনি আমার বিদ্যায়তনের আচার্য্য। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করতে আপনি বাধ্য।...আমি যদি সন্ন্যাস নিতে চাই ত ওঁরা দেবেন না কেন?"

"কিন্তু তার জন্য ত অন্য ব্যবস্থা আছে—"

"অন্য ব্যবস্থায় যেতে যদি আমি না চাই? আমি যদি সেবার মধ্যে দিয়েই উপাসনা করতে চাই? সন্ন্যাসকে যদি আমি ওঁদের আদর্শেই কাজে লাগাতে চাই? ওঁদের আপত্তি কি?"

"সে ওঁরাই ভাল বলতে পারবেন। এ প্রশ্ন ত' কখনও করি নি। ত' আমার মনে হয় সন্ন্যাসের এবং ওঁদের ব্রতের বিঘ্ন হবে বলেই ওঁরা এর ভেতর মহিলাদের আসতে দিতে চান না।"

"কিসের বিঘ্ন বলুন ত'? সন্ন্যাসিনী মহিলারা থাকলেই যদি ওঁদের ব্রতের বিঘ্ন হয় ত' বুঝতে হবে ওঁদের চরিত্র এবং মন দুই-ই ঠুন্‌কো। ওঁরা ত' গৃহী মেয়েছেলের সঙ্গে খুব স্বচ্ছন্দে মেশেন, তাতে যদি বিঘ্ন না হয় ত' সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে মিশলে হবে?"

মণি বাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "এ-সব আলোচনার জায়গা কলেজ নয়। আমি এখানে এখানের কাজ করব বলেই বেতন পাই। তোমরাও বেতন দাও এখানের কাজ অর্থাৎ পড়াশুনোর জন্য। তুমি এখন এসো।"

তিনি কলিংবেল টিপলেন।

এ অপমানের জন্য নন্দিতা যেন প্রস্তুতই ছিল। সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না। বললে, "বেশ, কলেজের বাইরেই হবে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা করাই রইল স্যার"—

এর দিন দুই পরেই কী কারণে এক দিন কলেজ বন্ধ ছিল। বেলা তিনটের সময় বই রেখে উঠে মণি বাবু চায়ের জল চাপাবেন ভাবছেন, এমন

সময় কড়া নড়ে উঠল। ছাত্ররা তাঁর বাড়ী আসে মধ্যে মধ্যে, তাদেরই কেউ এসেছে ভেবে মণি বাবু নিচে নেমে গিয়ে ছিটকিনিটা খুলে অভ্যাস-বশতঃ পিছিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু দেখা গেল, যে এসেছে সে সেদিনকার সেই 'জ্যাঠা-মেয়ে'টি সে একেবারে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিয়ে ঘাম মুছতে লাগল।–

অতক্ষণে মণিবাবুও ঘেমে উঠেছেন। বিস্ময়ে তাঁর বাক্‌রোধ হবার উপক্রম।

"এ সব কী ব্যাপার? মানে এখানে ত আমি।"—

"সেদিনও কথাটা শেষ হয় নি তাই! তা ছাড়া আমার কিছু অন্য ...ও আছে।"

নাশ! এ পাপ এখনই বিদায় করা প্রয়োজন। ভদ্রতার অবসর ... তিনি একটু রূঢ় ভাবেই বলে উঠলেন, "কিন্তু এখানে কেন?"

"কলেজে বলবেন সেখানে নয়, বাড়ীতে বলবেন এখানে নয়—তা হলে থায় যাবো বলুন? আমার নৈতিক জ্ঞান বিকাশের দায়িত্বও কি কতক পনার নেই?"

"আমি—কিন্তু আমি বাড়ীতে কোন মহিলাকে ঢুকতে দিই না। আমার নিকট-আত্মীয়াকেও না।" মরীয়া হয়েই বলে ওঠেন মণি বাবু।

"কেন, চরিত্র নষ্ট হবে বলে? আপনার ত' ঢের বয়স হয়েছে। তা ছাড়া এতকাল কঠিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করছেন, ঠাকুরকে ডাকছেন—এতটুক ...র জোর হয় নি? মোদ্দা, আমার যা বক্তব্য তা আপনাকে শুনতেই হবে। ...লিশ না ডেকে আমাকে তাড়াতে পারবেন না!"

রাগে মণি বাবুর মুখ-চোখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি কিছুটা তেভম্বও হয়ে পড়েছিলেন। কী করবেন, কী বলবেন—ভেবে পেলেন না।

তখন নন্দিতাই একটু মিষ্টি হেসে বললে, "ভয় নেই, বেশীক্ষণ বসব না। তাই মনটা আমার কিছু দিন থেকে বড় অশান্ত হয়েছে। সন্ন্যাস যদি ...তে না-ই পারি, কী ভাবে ঘরে থেকেই মনে জোর আনা যায়, নিজেকে

বাঁচিয়ে সেবাব্রতে মন দেওয়া যায়, সেই সম্বন্ধেই আপনার [illegible] আলোচনা করে চলে যাবো। চলুন, ওপরে চলুন।"

স্তম্ভিত হতবাক মণিবাবু সত্যিই সরে ওকে পথ দিলেন—এবং পিছু-পিছু ওপরের ঘরে এসে পৌঁছলেন।

ঘরে ঢুকে কিন্তু নন্দিতা বসল না। হাতের ছোট্ট ঘড়িটার দিকে বলল, "সাড়ে তিনটা বাজে। এই ত' আপনার চা খাবার সময়, না? ছেলেদের মুখে সব শুনেছি। ঐ বারান্দার কোণে আপনার হীটার চায়ের সরঞ্জাম থাকে। আপনি বসুন, আমি চা ক'রে এনে দিচ্ছি। নেই, আমি ভাল করে হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার করেই ক'রে আনব।"

এই বলে—আর উত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়ে নন্দিতা ওধারে গেল। মণি বাবু আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, উপযুক্ত ভাষার অভাবে করে গেলেন। অগত্যা তিনি পাখাটা খুলে দিয়ে এসে নিজের [illegible] বসলেন। এমন বিপদে জীবনে পড়েন নি। রাগে বিরক্তিতে—একটা যেন যন্ত্রণাই অনুভব করছিলেন তিনি। মনে মনে ইতিমধ্যেই ব[illegible] প্রতিজ্ঞা করলেন, চাকরী ছেড়ে দেবেন এবং বাড়ীতে দারোয়ান বসাবেন।

কিন্তু সে ত পরের কথা। মেয়েটা এতক্ষণ কী করছে? কৈ কাপড়া নাড়ারও ত শব্দ পাচ্ছেন না। মীটসেফের মধ্যে দুধ আছে, খুঁজে পাবে না হয়ত।

খানিক পরে মণি বাবু আর বসে থাকতে পারলেন না। উঠে বারা[illegible] দিয়ে এধারে এলেন।

জলটা হিটারে ফুটছে, কিন্তু নন্দিতা সেখানে নেই···সামনেই ঠাকুর ঘ[illegible] কেমন ক'রে সে যেন তা' অনুমান করে দরজা খুলে কখন ভেতরে ঢুকেছে মণিবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, রামকৃষ্ণের ছবির সামনে উপুড় হয়ে প[illegible] প্রণাম করছে সে।

অনেকক্ষণ মণি বাবু দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। নন্দিতা কিন্তু উঠল নড়লও না। তার সেই ভক্তিতদ্‌গত একান্ত আত্মনিবেদনের ভঙ্গীটি

লাগল মণি বাবুর। তিনি নিঃশব্দে সরে আবার নিজের জায়গায় এসে ন। এই ধরণের অল্পবয়সী মেয়ের ঠিক এতটা ভক্তি আশা করেন নি। নিজের অজ্ঞাতেই তিনি যেন অনেকখানি কোমল হয়ে পড়লেন।

আরও অনেকটা পরে কাপডিসের শব্দ হল। তার খানিক পরেই ছু'লা চা এবং ওঁর জন্যে ছু'খানি পাৎলা টোস্ট তৈরী করে এনে সামনে রাখলে। তখনও তার চোখের পাতা ছু'টি যেন ভিজে-ভিজে। মুখের ভাবেও সেই তন্ময়তার বেশ।

মণি বাবু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "তুমি টোস্ট নিলে না ?"

ঈষৎ লজ্জিত ভাবে হেসে নন্দিতা বললে, "অনেক বেলায় খেয়েছি, এখন কিছু খাবো না।"

সে টোস্টের ডিশটা ওঁর দিকে ঠেলে দিয়ে অনিমন্ত্রিত ভাবেই একটা চায়ের পা নিজের দিকে টেনে নিলে। ওর এই সহজ ব্যবহারটুকুও মণি বাবুর খুব লাগল।

চা খাওয়া শেষ হলে নন্দিতা খালি কাপ-ডিশগুলো জড় করে উঠে দাঁড়াল। ার মণি বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ওগুলো ঐখানে নামিয়ে রাখো। একটু রই ঝি আসবে !"

"না না। ছেলেরা রেখে দেয় সে আলাদা কথা। আমি রেখে দেব য়ের জন্যে ? এগুলো ধুয়ে রাখতে কি-ই বা সময় লাগবে ?"

সে আর প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়েই সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল— ং মণি বাবু ঘরের মধ্যে বসেই লক্ষ্য করলেন,—সযত্নে ধুয়ে-মুছে কাবার্ডে জিয়ে রাখল।

তারপর ফিরে এসে ওঁর সামনা-সামনি একখানা বেতের চেয়ারে শান্তভাবে ন পড়ে বললে, "আপনি ঠাকুরের কথা কিছু বলুন। আমার মনটা যাতে টু শান্ত হয়।"

মণি বাবু কোমল কণ্ঠেই বললেন, "কিন্তু তুমি সন্ন্যাস নেবার জন্যেই বা এত কেন ?"

"ওটা আর কিছু নয়। অনেক সময় গেরুয়াটা ধর্ম্মের কাজ করে। জন্যই ওটা প্রয়োজন। আসলে আমি সেবাই করতে চাই মানুষের
এরপর আলাপ জমে উঠতে বিলম্ব হল না।

মণি বাবুর প্রিয় বিষয়বস্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর বাণী, তাঁদে মানুষের নানা দুর্ব্বলতা—কেমন করে সে তার নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা সরে প্রায় ছ'ট এসে পৌঁছল।

হঠাৎ খেয়াল হল ঝি আসতে। নন্দিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলে আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম। আমাকে ক্ষমা করুন। যা দেন ত' আর একদিন এসে দু'-একটা প্রশ্নের উত্তর জেনে নেব।"

বলতে বলতে যতই মেতে উঠে থাকুন মণি বাবু—এটা তাঁর চোখ এ নন্দিতা সত্যিই সমস্ত কথা একান্ত মনোযোগে শুনে যাচ্ছে এবং মাঝে একটি যা প্রশ্ন করছে তাতে বোঝা যায় যে সে ওঁর কথাগুলো বুঝছেও হ

সুতরাং ওর ওপর প্রসন্ন হবারই কথা। মণি বাবুও খুশি হলে সঙ্গে সঙ্গে নিচে অবধি নেমে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তোমাকে অ দু-তিনটি বই দেব, সেগুলো পড়ে দেখো, অনেকটা বুঝতে পারবে।"

"কবে দেবেন?" সাগ্রহে প্রশ্ন করে নন্দিতা।

"কাল বরং কলেজে দেখা করো। ওখানেই নিয়ে গিয়ে রাখব।"

•

নন্দিতা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে তার অভিনয়ে কোথাও (রাখবে না। তাই বইগুলো পাবার তিন দিন পরে আবার যখন বাবুর বাড়ী গেল, তখন শুধু যে তার সেই বইগুলো আদ্যোপান্ত প তাই নয়, সে সম্বন্ধে যা-যা প্রশ্ন উঠতে পারে, তাও তৈরী হয়ে গেছে।

এতখানি আন্তরিকতা ও মনোযোগ মণি বাবু ঐটুকু মেয়ের কা করেন নি। তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। সেদিনও চা করে নন্দিতা। শুধু তাই নয়, ওঁর আসবার আগে এক রকম জোর ক

ত্রের খাবার তৈরী ক'রে রেখে এল। দীর্ঘকাল পরে মণি বাবু রাত্রে টাটকা —র খেলেন।

আরও কিছু কিছু বই তিনি দিলেন। আরও কিছু আলোচনা চলল। চলল ক দিন আসা-যাওয়া। তারপর একদিন নন্দিতা ওঁকে প্রণাম করে ল, "আমি মন স্থির করে ফেলেছি স্যার! কলেজ ছেড়ে দেব। আর বোধ আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।"

চমকে উঠলেন মণি বাবু। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম বেদনাবোধও করলেন।

"সে কি! কেন?" আড়ষ্ট ভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"এসব ভাল লাগছে না তা ত আপনি জানেন-ই। আমি কাজে মন দেব। আগে কিছু দিন সাধনা করব, মন যাতে তৈরী হয়!"

মণি বাবু চুপ করেই রইলেন। কি-ই বা বলবেন!

অনেকক্ষণ পরে বললেন, "সংসার বড় কঠিন জায়গা নন্দিতা, আত্মরক্ষা ত পারবে ত?"

"চেষ্টা করব।" তারপর একটু থেমে, একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে ল, "একটা কথা ছিল স্যার!"

"বলো বলো! নিঃসঙ্কোচে বলো।"

"আমাকে একটা কিছু উপহার দেবেন আপনি? যা আমি দিন রাত ছে রাখতে পারব। যা বিপদে আমাকে দৈব-কবচের মতই রক্ষা করবে। টা দেখলেই মনে পড়বে আপনার কথা—আর তাহ'লেই সব দুর্ব্বলতা ঝেড়ে লতে পারব।"

ওর কেমন একটা করুণ বলবার ভঙ্গীতে মণি বাবুর চোখে জল এসে ল। তিনি যেন একটু ব্যাকুল ভাবেই বললেন, "কিন্তু সে-রকম কী জিনিস? পোর্টফোলিও ব্যাগ-ট্যাগ—? বা ঐরকম কিছু?"

"ওসব আর কী হবে স্যার! যা সর্ব্বদা সঙ্গে থাকবে, গায়ে লেগে থাকবে মন কোন জিনিস"—

"কী বলো আংটি ?"

"না, আংটি পরতে আমার ভাল লাগে না। আপনি আমাকে একজো… কানের দুল দিন।"

"দুল! কিন্তু সে ত আমি—। তুমি বরং একটা কিনে নিও, আ… দাম দিচ্ছি।"

"না, না। সে আমার চাই না! আপনি নিজে হাতে ক'রে দেবে…।"

"তাই ত!" মণি বাবু বিপন্ন মুখে ওপাশের বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিটা… দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "বেশ, চলো, তু… পছন্দ ক'রে কিনে নেবে। আমি ত ওর কিছুই জানি না।"

"পছন্দ টছন্দ আমি কিছু করব না। আপনার যেটা… নন্দিতাকেই ? মানাবে, আপনি সেইটেই কিনবেন। তবে কম দামের আ… কিছু—। আপনি যা দেবেন তাই আমার ভাল লাগবে। আমার জীবনের চিরসঙ্গী হয়ে থাকবে তা।"

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ভাবলেন মণি বাবু। তারপর বললেন, "বেশ, আমি কাল এনে রাখব। তুমি কলেজ থেকে নিয়ে নিও। কেমন ?"

নন্দিতা আবারও একটা প্রণাম করে বেরিয়ে এল।

মণি বাবু পরের দিনই দুল কিনলেন। কলেজে নিয়েও এলেন রুমালে মুড়ে সযত্নে। কিন্তু নন্দিতা সে দিন এল না। তার পরের দিনও না। মণি বাবু চিন্তিত হয়ে বাড়ী ফিরলেন। খবর একটা নেওয়া দরকার কিন্তু তিনি সঙ্কোচে কিছুতেই সে কথাটা কাউকে বলতে পারলেন না। ঠিকানাটা জানতে গেলেও কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

বাড়ী ফিরে দেখলেন একখানি খামের চিঠি পড়ে আছে তাঁর নামে। মেয়েলি হাতের লেখা। সেখানা দেখে, কে জানে কেন, হঠাৎ ওঁর একটা দুর্ব্বলতা-বোধ হল। সেই সঙ্গে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা।…বক্ষস্পন্দন অকারণেই যেন বেড়ে গেল একটু। নিজের মনোভাবে নিজেই চমকে

ঠলেন—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। চিঠিখানা তখনই খুললেন না। মুখ হাত ধুয়ে তৈরী ক'রে এনে ধীরে-সুস্থে খামখানা খুললেন—

তাঁর অনুমানই ঠিক। নন্দিতারই চিঠি। দীর্ঘ চিঠি।

সমস্ত ইতিহাসটাই দিয়েছে সে। বাজি রাখা, তার অভিনয়,—সব কথাই খুলে লিখেছে। তারপর লিখেছে, "বাজী জিতেছি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে হেরেও বসে আছি। এত দিনের নিভৃত সাহচর্য্যে আপনার যে পরিচয়টি আমি পেয়েছি, তারপর আর কোন মতে আপনাকে ছোট দেখতে পারব না। বরং আমি সকলের কাছে নাকেখৎই দেব—তবু আপনাকে নিয়ে সকলে হাসাহাসি [illegible], এ আমি সইতে পারব না। একটা কথা ঠিকই ব'লে [illegible] গাম্ভীর্য কলেজে আর আমি যাবো না। আর হয়ত পড়বও না। [illegible]র [illegible] আ[illegible]র কাছ থেকে যা শিক্ষা পেয়েছি, সাংসারিক জীবনে সেই শিক্ষাই কাজে লাগাব। অন্ততঃ এখন থেকে তারই সাধনা করব। যদি পারেন ত' আমাকে ক্ষমা করবেন! আপনার পক্ষে সবই সম্ভব—তাই ভরসা করছি, এর পরেও হয়ত আপনার ক্ষমা পাবো। আমার শত কোটি প্রণাম নেবেন।"

সে দিন সে চিঠি পড়তে বহু কাল পরে মণি বাবুর দুই চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে জল ভরে এসেছিল! এত ব্যথা, নাম না জানা অকারণ এতখানি বেদনা আর বোধ হয় জীবনে তিনি কোন দিন পান নি।

কিন্তু সে-ও বহুকালের কথা। সে বেদনা বোধ করি ভুলেই গিয়েছিলেন মণি বাবু, সেই সঙ্গে লোহার সিন্দুকে রাখা দুল-জোড়াটার অস্তিত্বও—

হঠাৎ আর একটা রূঢ় আঘাতে সে দিন আবার সব কথাগুলোই মনে পড়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর দিন, মৃত্যুর অল্প কিছুক্ষণ আগেই।

উত্তর প্রদেশের একখানা কি কাগজ এসেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে ওলটাতে-ওলটাতে চোখে পড়েছিল একটা খবর,—"শ্রীমতী নন্দিতা মজুমদার তাঁর এক মাত্র পুত্র মণিভূষণের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে (যার শোচনীয় অকালমৃত্যুর

সংবাদ আমরা গত সপ্তাহেই দিয়েছি) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মণিভূষ স্মৃতি-বক্তৃতা-মালার' ব্যবস্থা করেছেন। রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃত দিতে হবে—যিনি দেবেন, তিনি পাঁচ শত টাকা ক'রে পুরস্কার পাবেন শ্রীমতী মজুমদার এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে এককালীন—ইত্যাদি।

সে দিনও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন মণি বাবু। খবরটা পড়বা পর আজও অনেক দিন পরে তাঁর চোখ দু'টো ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছিল।

পুলিন বাবু এসে যখন কথা কইছেন তখনও তাঁর মন করছিল স্মৃতির রোমন্থন। ফুলটার কথাও মনে পড়েছিল তাঁর সেই সময়ে। ওটা সরাতে হবে। যদি আর কারুর হাতে পড়ে?…পাঠিয়ে দেবেন নাকি [illegible]কেই ? …ঠিকানা?…সেটা জোগাড় করা এমন আর কঠিন কি ?

বুকটায় যেন কেমন ব্যথা করছে। বড় গরমও পড়েছে আজ!

এমনি ব্যথা, এমনি নাম-না-জানা একটা বেদনা সে দিনও যেন অনুভব করেছিলেন, সেই চিঠিখানা পাবার দিনও। কিন্তু…সে ত-ত বহু দিনের কথা। সে সব কেমন যেন ঝাপ্‌সা একাকার হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যথাটা। কে জানে কেন আজও—। উঃ—

তার পরের কথা মণি বাবু আর জানেন না।

নিরুত্তর

পথে ঘাটে দুর্ঘটনা ঘটাটা এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। নিত্যই ঘটছে। নিত্যই বহুলোক মরছে—স্ত্রী-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে। কিন্তু সদিন পালপাড়ার মোড়ে যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—সেটা একটু বিচিত্র বৈ কি!

দিনে দুপুরে—পথে তেমন ভীড়ও ছিল না তখন—হঠাৎ মালবোঝাই ভারি লরীখানা বেঁকে ফুটপাথের ওপর উঠে গিয়ে একটা বাড়ীর গায়ে ধাক্কা মারল। গাড়ীর বিশেষ কিছু হ'ল না, মালপত্র যেমন ছিল তেমনি রইল—লোকসানের ভেতর কর্পোরেশনের একটা ল্যাম্প-পোস্ট একটু বেঁকে গেল, আর গেলেন ১৩।১।এফ্‌ নম্বর বাড়ীর শ্রীবিলাস বাবু। হাসপাতালে নিয়ে যেতেও তর সইল না, য়্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছবার আগেই তিনি ইহজীবনের মত চোখ বুজলেন।

ইঞ্জিন খারাপ ছিল? কৈ না, পুলিস উপযুক্ত লোক দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিয়েছে; কোথাও কোন গোলমাল ধরা পড়ে নি।

ড্রাইভার মদ খেয়েছিল? তাও ত নয়। কারণ, যে উন্মত্ত জনতা চারিদিক থেকে হঠাৎ গজিয়ে উঠে তাকে ধরে সহজভাবে শ্রীবিলাস বাবুর সঙ্গী ক'রে দিতে চেয়েছিল, তারাও ও অপবাদ কেউ দিতে পারে নি। সবাই স্বীকার করেছে, আর যাই হোক্‌, মদের গন্ধ কেউ পায় নি তার মুখে। সে লোকটি নিজেও বার বার কসম খেয়ে বলেছে যে, সেদিন সে তখনও পর্য্যন্ত মদ [illegible] নি। তাছাড়া কাজ-কাম সেরে রাতেই তারা কোন কোনদিন এক-[illegible] ফুর্ত্তি করে। সেটা তখনও ফুর্তি করার সময় নয়।

তবে?

[illegible]তবের উত্তর ড্রাইভার রামলগনও ভাল ক'রে দিতে পারে নি। সে বার-[illegible] একই কথা বলেছে—'কী ক'রে যে কি হল বাবুসাব, তা বলতে পারব [illegible]মি বেশ সুস্থই ছিলাম, পথে কেউ ছিলও না তেমন যে তাকে বাঁচাতে

যাবো, যেভাবে স্টিয়ারিং ঘোরাবার কথা সেভাবেই ঘুরিয়েছি—কী ক'রে যে হঠাৎ অমনভাবে গাড়ী বেঁকে ফুটপাথে উঠে গেল তাও আমি বলতে পারব না। যেন মনে হ'ল বাবুসাব্, কে টেনে নিয়ে গাড়ীখানাকে আছাড় মারলে দেওয়ালে!'

সুতরাং কোন মীমাংসাই হ'ল না এ রহস্যের। সরকারী তদন্ত হ'ল, খবরের কাগজে লেখালেখি হ'ল, য়্যাসেমব্লীতে প্রশ্ন উঠল, বিরোধীদলের নেতারা গরম গরম বক্তৃতা করলেন, বে-সরকারী তদন্ত দাবী করা হ'ল—মুলতুবী প্রস্তাব উঠল—তারপর আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শুধু শ্রীবিলাস বাবুর ক্ষুদ্র সংসারে এই সত্যটা বহুকাল ধরে ঘুরে-ফিরে নানা কাজে নানা অভাবে নিত্য-স্মরণীয় হ'য়ে রইল যে,—শ্রীবিলাস বাবু নেই এবং তাঁর সঙ্কল্পিত ইন্‌সিওরেন্সের প্রথম প্রিমিয়ামটাও দিয়ে যেতে পারেন নি! এক কথায় স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের অকূলে ভাসিয়ে চলে গেছেন।

কিন্তু এই ঘটনায় দুর্ঘটনার কারণ ছাড়াও আর একটি রহস্য অমীমাংসিত রয়ে গেল। সে কথাটা—যাঁরা সংবাদপত্র পড়েন নিয়মিত, তাঁদের চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই—হয়ত অতটা লক্ষ্য করেন নি। ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন শ্রীবিলাস বাবু তাঁর বাড়ী থেকে এক বোঝা বই নিয়ে কোথায় বেরোচ্ছিলেন বইগুলি একটা ছেঁড়া গামছায় পুটুলি বাঁধা ছিল, কিন্তু সেটা কিছু রহস্য নয়—রহস্য যা তা হচ্ছে এই—বইগুলি সবই পরলোক তথা জন্মান্তর সম্প[illegible] 'পরলোকের কথা' 'মৃত্যুর পরপারে' 'জন্মান্তর রহস্য'; 'আঁধারের পারে'—[illegible] সব নানা নামের এবং নানা আকারের বইগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় এক, [illegible] পরে কোন জীবন আছে কি নেই! ঐ বইগুলি অমন পুঁটুলি বেঁধে শ্রীবিলাসবাবু কোথায় যাচ্ছিলেন? আর সেদিন অফিস খোলা, ছুটির নয়—অফিসে না গিয়ে তিনি বাড়ীতেই বা করছিলেন কি?

এ-সব প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল চিরকালের মত। এ-সব নিয়ে জনসাধারণ বা জননেতারা—কেউ মাথা ঘামান নি। শুধু বিশেষ দু[illegible] একটু কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেন মাত্র।

আসল রহস্যটারও কোন মীমাংসা হ'ল না।

কেন এ ঘটনা ঘটল? শ্রীবিলাসবাবু কেন মারা গেলেন?

এ রহস্যের কিছু সদুত্তর বোধ হয় দিতে পারতেন—একজন লোক। তিনি হ'লেন শ্রীবিলাসের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং চিরদিনের তর্ক-সহচর—হরিকেশববাবু। মজার কথা এই, তদন্তের সময় তাঁকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা কারুর মাথাতে যায় নি।

হরিকেশব কলেজ জীবনে শ্রীবিলাসের সহপাঠী ছিলেন। তারপর প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায়—সহকর্ম্মীও হতে পেরেছিলেন। সুতরাং গত দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে তাঁরা দিন-রাতের অনেকখানি সময়ই একসঙ্গে কাটিয়েছেন (ঠিক চল্লিশ বছর.বয়সে নাকি শ্রীবিলাস মারা গেছেন) আর এই সময়েরও বেশীর ভাগ তাঁদের কেটেছে তর্ক করে। শ্রীবিলাস আর হরিকেশব দুজনেই তর্ক করতে ভালবাসতেন এবং সে তর্ককে আর যা-ই হোক্ অবসর-বিনোদনের খেয়াল মনে করার কারণ নেই। কারণ যদিচ তর্কটা তাঁদের প্রাত্যহিক এবং প্রায় প্রতি-মুহূর্ত্তিক ছিল, তবু তাঁরা বেশ আন্তরিকভাবেই তর্ক করতেন। তর্ক করতে করতে প্রায়ই দু'জনের চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠত, দুই কশের প্রান্তে থুথু জমত, কপালের ও গলার শিরাগুলো উঠ্‌ত ফুলে। তবু তাঁরা তর্ক থামাতেন না। সকাল থেকে চলে অফিস যাওয়ার সময়ে সেটা মুলতুবী থাক্‌ত—আবার অফিস থেকে ফেরার পর শুরু হয়ে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গড়াত। উভয়েরই সংসার এবং নিত্যকার জীবনের বাকী কাজগুলো কীভাবে চলত, সেটা পরিচিত সকলকার কাছেই বিস্ময় এবং আলোচনার বস্তু হয়ে ছিল।

প্রথম যৌবনে তর্কের বিষয়বস্তুটা অবশ্যই রাজনীতি ছিল। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ক্রমান্বয়ে সাহিত্য, দর্শন, ঈশ্বরতত্ত্ব ঘুরে পরলোকতত্ত্বে এসে পৌঁচেছিল। গত দুবছর ধরে ওঁরা বলতে গেলে আর কিছুই আলোচনা করেন নি—অথবা আর কোন কথা নিয়ে তর্ক করেন নি।

দেহত্যাগেই কি সব শেষ?

না মরবার পরেও কোন জীবনের অস্তিত্ব আছে ?

হরিকেশব বলতেন, "ফুঃ !···সমুদ্রে ঢেউ ওঠে আবার সমুদ্রে মিলিয়ে যায়—সাগরকে লহরী সমানা।···পঞ্চভূতের সমুদ্রে আমরা বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র—হঠাৎ উঠেছি হঠাৎই মিলিয়ে যাবো। পরলোক আবার কি ? এই বিশ্বে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্র আছে, এই পৃথিবীর মত কত কোটি গ্রহ তাদের কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে। সেই সব গ্রহে এমনি কত জীব আছে—তাদের জন্যে যদি মরবার পরেও আবার একটা বাসার ব্যবস্থা করতে হয়, তা হ'লে ত ভগবান নাচার !"

শ্রীবিলাস উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। ইদানীং তিনি ইংরেজী, বাংলা বিস্তর বই কিনেছিলেন পরলোক সম্বন্ধে। সে-সব বইয়ে দেহাতীত জীবনের নানা চমকপ্রদ বিবরণ এবং প্রমাণ আছে—বই খুলে খুলে সেই সব অংশ পড়ে শোনাতেন ভদ্রলোক আর প্রশ্ন করতেন—"এসব কি মিথ্যে তাহ'লে ? এতগুলো লোক মিছে কথা কইছে ?"

হরিকেশব বলতেন, "অত শত আমি বুঝি না। নিজে চোখে না দেখলে—নিদেনপক্ষে অনুভব না করলে আমি বিশ্বাস করব না। একটি হেলদি হোলসাম প্রত্যক্ষ ভূত বার কর—বহুৎ আচ্ছা, আমি বিশ্বাস করতে রাজী আছি। শুধু বাত-এ ভুলছি না !"

কোনদিনই এসব আলোচনার কোন মীমাংসা হ'ত না।

অবশেষে একদিন শ্রীবিলাস বলে বসলেন, "তাঁর একটি পরিচিত ভদ্রলোক ভাল প্ল্যানচেট নামান—তাঁর বাড়ী যাওয়া যাক্।"

হরিকেশবও রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, "চলো, তোমার বুজরুকি ভেঙ্গে দিয়ে আসি।"

দিনক্ষণ দেখে সন্ধ্যার সময় একদিন গেলেন দু'জন। সে ভদ্রলোক একটা খালি ঘরে ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে মৃদু নীল আলো জ্বেলে প্ল্যানচেটের টেবিল পেতে বসলেন। ভদ্রলোক হরিকেশববাবুকে বললেন, "মৃত কোন আত্মীয়কে চিন্তা করুন আপনি। তিনিই আসবেন।"

হরিকেশব শ্রীবিলাসের দিকে চেয়ে বললেন, "আমার বাবার কথাই ভাবি। তুমিও ত তাঁকে দেখেছিলে বহুবার। তুমিও ভাবো। তা হ'লেই ব্যাপারটা সহজ হবে।"

তিনজনে স্থির হয়ে বসলেন। একটু পরেই টেবিলে প্রাণ লক্ষণ দেখা দিল। সে ভদ্রলোক ফিস্-ফিস্ ক'রে বললেন, "এসেছেন এসেছেন আপনার বাবা। প্রশ্ন করুন। হরিকেশবও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বৈ কি।

দু' একটা প্রশ্ন করলেন। কাগজের ওপর তার যথাযথ উত্তরও ফুটে উঠল।

যথা—হরিকেশবের স্ত্রীর নাম, বোনের নাম, ছেলেদের নাম।

হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, শ্রীবিলাসেরই হাতটা সম্পূর্ণ প্ল্যানচেটের ওপর আছে। নড়ছে হয়ত আপনিই, কিন্তু তবু—!

তিনি ফস্ ক'রে বলে বসলেন,"আমার প্রপিতামহের নামটা লিখুন ত বাবা ?"

তিন-চারটি নাম লেখা হ'ল। কোনটাই মিলল না।

হরিকেশব চেঁচিয়ে উঠলেন, "বোগাস্। অল্ বোগাস্। আমিও বেশ বুঝে নিয়েছি। ও তোমাদের এক রকমের সেলফ্ হিপ্‌নটিজম্।"

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। শ্রীবিলাস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। গৃহস্বামী বিরক্ত হ'য়ে উঠে আলো জেলে চায়ের ফরমাস করলেন।

অর্থাৎ আবারও তুমুল তর্ক বেধে ওঠবার ভূমিকা রচিত হ'ল।

শ্রীবিলাস বললেন, "তোমার বাবার যে তাঁর ঠাকুর্দার নাম জানা ছিল তার প্রমাণ কি ?"

"বাবা আমাকে ছেলেবেলাতে দশ পুরুষের নাম মুখস্থ করাতেন। সেকেলে লোক, ঠাকুর্দার নাম ভুলে যাবেন সেটা সম্ভব নয়। বিশেষ পরলোকে গিয়ে ত সর্ব্বজ্ঞ হবার কথা !...এই ত তোমরাই বলেছ যে, মাননীয় ভূতেরা এসে কত কি সব অজানা খবর দিয়ে গেছেন !"

যাঁর বাড়ী তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "তাঁর সান্নিধ্য পেয়েও আপনি সন্দেহ করছেন, এতেই তিনি বোধ হয় বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। ইরিটেটেড হ'লে কন্‌ফিউশ্যান্ আসাই স্বাভাবিক।"

"আজ্ঞে সে ত দেহীদের পক্ষে। বিদেহীরাও যদি সামান্য বিরক্তিতে বাপ ঠাকুর্দ্দার নাম ভুলে বসেন, তা হ'লে বুঝতে হবে যে, তাঁদের অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ।...চলো হে শ্রীবিলাস, ওঠো।"

শ্রীবিলাস কথা কইলেন না। এমন কি যখন চা-টা এল তখনও কতকটা অন্যমনস্কভাবেই চা খেলেন বসে বসে—যদিচ তাঁর চা-প্রীতি অসাধারণ—শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরার পথেও হরিকেশববাবুর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইলেন না। সেটা তাঁর পরাজয়ের লজ্জা মনে ক'রে হরিকেশব মনে মনে খুব হেসে নিলেন!

এর পর থেকেই শ্রীবিলাসবাবুর কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে গেল। জীবনের যেটা ছিল প্রধান অবলম্বন—তর্ক, সেটাতেও যেন আর রুচি রইল না তেমন। দিন-রাতই গুম্ খেয়ে বসে থাকেন, কেউ কথা কইলে সংক্ষেপে 'হাঁ' 'না' উত্তর দেন। কোন প্রলোভনেই আর তর্কে নামতে চান না—এ-বিষয়ে হরিকেশবের সহস্র কলা-কৌশল ব্যর্থ হয়।

তবে তিনি কি করেন?

অফিসের সময়টুকু ছাড়া, বাকী সমস্ত সময়টাই পুঁথিতে ডুবে থাকেন। হরিকেশববাবু নিয়মিত আসেন কিন্তু তাঁর দিকে একটা বই কি কোন সাময়িক-পত্র এগিয়ে দিয়েই শ্রীবিলাসবাবু আবার বালিশের ওপর উপুড় হয়ে পড়েন; সামনে বই খোলাই আছে—তাইতেই ডুবে যান মুহূর্ত্তের মধ্যে।

আসলে শ্রীবিলাসবাবুর আত্মাভিমানে প্রচণ্ড একটা ঘা লেগেছে। এতকালের কোন পরাজয় তাঁকে কোন দিন এত বিচলিত করে নি—সেদিনের ঐ ক্ষুদ্র ঘটনাটি যতটা করেছে! এটা যেন তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় এবং অপমান! তা হ'লে তিনি এতদিন পড়াশুনো করে যা বুঝেছেন তা কি সবই ভুল? তিনি কি এতটুকু লেখাপড়া শেখেন নি—তাঁর কি এতটুকু সহজবুদ্ধি নেই যে, তিনি এর ফাঁকিটা ধরতে পারেন?

না। তাঁর কোথাও কোন ভুল হয় নি। হরিকেশবটাই নির্ব্বোধ। হামবাগ। কিন্তু সেটাও যে প্রমাণ-সাপেক্ষ। হরিকেশবকে প্রমাণ ক'রে দিতে হবে যে, সে

নির্বোধ এবং হামবাগ! তাকে দিয়ে স্বীকার করাতে হবে যে, পরলোক আছে—আত্মা আছে—এই দেহটা ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সবকিছু ফুরিয়ে যায় না।

অথচ সেটার উপায় কি?

প্রাণপণে সব বইগুলো পড়েন আবার। নিজের বিশ্বাসে না কোথাও ফাঁক থাকে! যতই পড়েন ততই মনে হয় যে, না—তাঁর কোথাও বোঝবার কোন ভুল হয় নি। ঐ হরিকেশবটাই—

পড়েন—এবং তার জানা যতগুলো উপায় আছে পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবার, সবগুলোই প্রয়োগ করেন। তারপর পরিচিত অপরিচিত যে-কোন আত্মারই নাগাল পান না কেন—কাকুতি-মিনতি করেন, "যেমন ক'রেই হোক ঐ হরিকেশবটাকে বুঝিয়ে দিন, আপনাদের অস্তিত্ব যেন কোনমতেই ও আর অস্বীকার করতে না পারে। এমন শিক্ষা দিন যাতে এই হামবাগিজ্‌ম্‌-এর জন্যে রীতিমত অনুতাপ হয় ওর—আর কখনও ওর এত আস্পর্দ্ধা না হয়—

কিন্তু কোন আত্মাই যে এ অনুরোধে কর্ণপাত করেন বলে মনে হয় না। দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে যায়। হরিকেশবের সবিদ্রূপ দৃষ্টি ওঁকে প্রতিনিয়তই বেঁধে; তাঁর প্রসন্ন হাসিকেও ওঁর করুণা ব'লে, তাচ্ছিল্য ব'লে বোধ হয়।

অবশেষে শ্রীবিলাস যেন আর স্থির থাকতে পারলেন না। বন্ধুর বাড়ী প্ল্যানচেটে নিজের বাবার আত্মাকে নামিয়ে (অন্তত শ্রীবিলাসের বিশ্বাস সেই স্বর্গত আত্মা পুত্রের আব্‌দারে নিরানব্বুইয়ের পাঁচের তিন নম্বর দীনদয়াল বসু মজুমদার স্ট্রীটের আলোকবাতাসহীন কক্ষে সত্যিই এসেছিলেন সেদিন) চরমপত্র বা আল্‌টিমেটাম দিয়ে দিলেন যে, আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে যদি হরিকেশবটা রীতিমত জবাব না পায়, তার ধৃষ্টতার, তার ঔদ্ধত্যের ও তার নির্ব্বুদ্ধিতার—তা হ'লে তিনিও আর পরলোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। তিনিও ধরে নেবেন যে, এতদিন ধরে তিনি আত্মপ্রবঞ্চনাই করেছিলেন—আসলে পরলোক, ভূত, আত্মা কিছুই নেই!···

এর পরও তিনটি দিন নির্ব্বিবাদে কেটে গেল। হরিকেশবের মুখের সকৌতুক ও সহজ হাসি এতটুকুও ম্লান হ'ল না। উল্লেখযোগ্য এমন কোন ঘটনাই ঘটল না যে, এ-বিষয়ে টেনেটুনেও কিছু প্রমাণ করা যায়। এতবড় একটা 'চ্যালেঞ্জ' যে তাঁকে উপলক্ষ ক'রে দেওয়া হয়েছে, তা হরিকেশব সন্দেহ মাত্র করলেন না।

এধারে এই তিনটি দিন এবং তিনটি রাত্রি শ্রীবিলাসের যেভাবে কাটল তা অবর্ণনীয়। আশা ও আশঙ্কা—বিশ্বাস ও সংশয়ের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত্ত দোলা খেয়েছে তাঁর মন। আশাটা শুধু নিজের পরাজয়েরই নয়—তা বললে শ্রীবিলাসের বন্ধু-প্রীতির ওপর একটু অবিচারই করা হবে—হরিকেশবের সম্বন্ধেও কিছু ভয় ছিল বৈকি! যদি ওর কোন বিপদাপদ ঘটে! আত্মারা যে কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন তার ত ঠিক নেই! নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে বন্ধুর কোন অনিষ্টের কারণ হবেন না ত!

কিন্তু আশা বা আশঙ্কা কোনটাই সফল হ'ল না। অবশেষে তৃতীয় রাত্রিটি বলতে গেলে কণ্টক শয্যায় জেগে কাটিয়ে ভোরবেলাই হরিকেশবের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন এবং ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে শ্রীবিলাস বললেন, "ভাই কেশব, তোমার কাছে একটা মাপ চাইবার আছে আমার। আফ্‌টার অল্‌ তুমিই ঠিক বুঝেছিলে, আমিই বেকুব্‌ মূর্খ—হামবাগ!"

হরিকেশব ত অবাক। আগের দুটো দিন মেয়ের অসুখে ব্যস্ত ছিলেন বলে শ্রীবিলাসের বাড়ী যেতে পারেন নি—আজ ওর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। তিনদিনে মানুষের এমনি চেহারা হয়? চোখের কোণে কালি, চোয়ালগুলো বসে গেছে, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত! এ কী কাণ্ড!

সব শুনে তিনি ব্যাকুলভাবে শ্রীবিলাসের হাত দুটো ধরে বললেন, সত্যি বলছি ভাই, তুমি এমন সিরিয়াস্‌লি কথাটাকে নিয়েছ জানলে ভদ্রলোক আত্মা ত দূরের কথা, ভূত-পেত্নী, শাকচুন্নি সব মেনে নিশ্চিন্ত হতাম! ইস্‌—কী ক'রে ফেলেছ দ্যাখো ত চেহারাখানা।

"ভয় নেই। আজই শেষ। আজই ওসব পাট চুকিয়ে দেবো। "আজ

সন্ধ্যায় অফিসের ফেরৎ নিজে হাতে ঐ সব বোগাস বইগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো।" ম্লান হাসলেন শ্রীবিলাসবাবু।

হরিকেশব হেসে বললেন, "আচ্ছা পাগল বটে। বরং আমাকে দিও এবার আমিই না হয় পাগল বনব।"

"না না। ওসব আর কারুরই পড়ে দরকার নেই।" শ্রীবিলাস উঠে দাঁড়ান।

"বসো বসো! চা খাও। এরি মধ্যে কি!"

হরিকেশব জোর করে টেনে বসান তাঁকে।

নিজে মুখে সন্ধ্যায় যাবেন বললেও শ্রীবিলাস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর সমস্ত বিশ্বাসের মূলে ঘা লেগেছে। সেই সঙ্গে আত্মসম্মানেও। জীবনে এতবড় পরাজয় কখনও ঘটে নি তাঁর। তাঁর সমস্ত তার্কিক সত্ত্বা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে ভাগ্যের এই আঘাতের বিরুদ্ধে।

স্নান ক'রে খেতে বসেই মনে মনে স্থির করলেন আজ আর অফিস যাবেন না। দুপুরে যখন পথে-ঘাটে কোন লোক থাকবে না,—তখনই তিনি চুপি চুপি ও পাপ চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

কিন্তু এ সঙ্কল্পের কথাটা কাউকেই বলেন নি। স্ত্রীকেও না। অফিসের নাম ক'রে বেরিয়ে সারা দুপুরটা লালদীঘিতে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুম? না ঘুম ছিল না তাঁর চোখে। ঘাসের ওপর বসে এক মনে ভেবেছেন, আর কেমন একটা রুদ্ধ আক্রোশে ছটফট করেছেন।

তারপর বেলা একটা নাগাদ ফিরে এসেছিলেন আবার। তখন কেউ ছিল না। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে, স্ত্রী ঘুমুচ্ছেন বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে। ঝি এসে দোর খুলে দিয়েছিল, কিন্তু তারও চোখে ঘুমের ঘোর—অসময়ে আসার কারণটা সেও জিজ্ঞাসা করে নি।

বাইরের ঘরে ঢুকে আলমারী খুলে সব বইগুলো বার করে নিয়ে পুঁটুলি বেঁধেছিলেন শ্রীবিলাসবাবু। তারপর কাউকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।···

তারপরের কথা আর তিনি জানেন না।

মৃত্যুর পরে যদি সত্যিই কোন জীবন থাকে ত সেখানে গিয়ে হয়ত জানতে পেরেছেন—কি ক'রে কেমনভাবে লরীটা বেঁকে এসে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দেওয়ালে আছড়ে পিষে ফেলেছিল !

হরিকেশববাবুকে করোনারে ডাকা হয় নি। পুলিশ তাঁকে কোন প্রশ্ন করে নি। এই পরের ব্যাপারটার মধ্যেই তিনি আসেন নি।

কিন্তু তাঁর মুখের সেই সকৌতুক হাসি ও প্রসন্ন দৃষ্টি—যেটা দূর ক'রে দেবার জন্য, মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে দেবার জন্য এত আকুতি ছিল শ্রীবিলাসের—শ্রীবিলাস জীবিত থাকলে দেখে সুখী হতেন যে, সে হাসি এবং দৃষ্টি—সংবাদটা পাবার পর থেকে একেবারেই চলে গিয়েছিল তাঁর। কর্ম্মে রুচি, তর্কে উৎসাহ এবং রাত্রের নিদ্রা কিছুই তাঁর ছিল না।

তবেকি, তবে কি শ্রীবিলাস মরেই জিতে গেলেন ?

তবে কি তাঁর চ্যালেঞ্জই জয়ী হ'ল শেষ পর্য্যন্ত। শ্রীবিলাসের কথাই কি ঠিক ?

কিন্তু শ্রীবিলাস মারা গেলেন কেন ? হরিকেশব ত মরতে পারতেন ! অবশ্য তাতে হরিকেশব তাঁর পরাজয়টা উপলব্ধি করবার সুযোগ পেতেন না—এটাও ঠিক।

কিন্তু তিন দিন ত পেরিয়ে গিয়েছিল। আল্‌টিমেটামের তিন দিন !

আসলে এটা হয়ত কাকতালীয়বৎ। ইংরেজীতে যাকে বলে কোইনসিডেন্স—আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র···

শ্রীবিলাসের স্ত্রীর কাছ থেকে বিক্রী ক'রে দেবার নাম ক'রে বইগুলো নিয়ে এসে নিজেই দাম বুঝিয়ে দিলেন হরিকেশব। বলতে গেলে পুরো দামই দিলেন। শ্রীবিলাসের স্ত্রী অত হিসেব রাখতেন না, তিনি আশাতিরিক্ত দাম পেয়ে খুবই কৃতজ্ঞ হলেন।

তারপর হরিকেশবও সেই বইগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। দিন রাতের সমস্ত অবশিষ্ট অবসর কাটতে লাগল তাঁর বুকে বালিশ দিয়ে ঐ সব বই পড়ে।

তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন। ঐ সর্ব্বনেশে সাংঘাতিক বইগুলোকে পুড়িয়ে ফেলবেন তিনি—এমন ভয়ও দেখান। ঐ বইগুলো হাতে ক'রে বেরিয়েই ত অতবড় সর্ব্বনাশটা হ'ল। আবার কি নিজেরও একটা সর্ব্বনাশ না বাধিয়ে ছাড়বেন না হরিকেশববাবু!

প্রায় হাতে পায়ে ধরে অনুনয় ক'রে স্ত্রীকে নিরস্ত করেন। কয়েকটা দিন, আর কয়েকটা দিন সময় চেয়ে নেন—

নির্জ্জন যায়গায় অন্ধকারে স্থির হয়ে বসে মনে মনে ভাববার চেষ্টা করেন পরলোকগত বন্ধুকে। অস্ফুট কণ্ঠে অনুরোধ জানান, "যদি সত্যিই তোমার আত্মা থাকে শ্রীবিলাস, আমাকে দেখা দাও। অন্ততঃ জানিয়ে দাও যে, তুমি আছ। একটা কোন প্রমাণ দাও। দোহাই তোমার।"

কিন্তু দিন সপ্তাহ মাস চলে যায়। কোন প্রমাণই কোথাও থেকে আসে না। শুধু হরিকেশববাবু দিন-রাত বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, প্রত্যয় ও সংশয়ের মধ্যে দোলা খেতে থাকেন। কিছুই জানা যায় না, মন স্থির করতে পারেন এমন কোন ঘটনা ঘটে না।

শুধু হরিকেশব দিন দিন শীর্ণ হ'তে থাকেন। তাঁর সারা জীবনটা বিষাক্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় পক্ষ

পুঁটি নিঃশব্দে বাহির হইয়া ভিতরের রকে দাঁড়াইল। তখন সকলে শুইয়া পড়িয়াছে, নীচের তলাটা সমস্তই অন্ধকার। উপরেও অন্যদিন এতক্ষণে সকলে ঘুমাইয়া পড়ে, আজ সে বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল যে এখনও সেখানে একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কান পাতিয়া যেন একটা চাপা গোঙানীর আওয়াজও শুনিতে পাইল, বোধ হয় মাষ্টার-গিন্নীর আবার অসুখ বাড়িয়াছে।

ভিতরের উঠানটা যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি দুর্গন্ধময়, সেখানে আসিয়া যে কোন মানুষ ইচ্ছা করিয়া দাঁড়ায় বা বিশ্রাম করে, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু পুঁটি প্রত্যহই গভীর রাত্রে এম্‌নি করিয়া এখানে আসিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকে, কোন কোন দিন খুব শ্রান্ত হইয়া পড়িলে এই জল জঞ্জাল এবং দুর্গন্ধের মধ্যেই বসিয়া পড়ে। ভোর হইতে সারা দিন এবং রাত্রি এগারোটা বারোটা পর্য্যন্ত তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না; এই সমস্ত সময়টা এমন গোলমাল ও কাজের মধ্যে কাটে যে তাহার সমস্ত প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে, সে এক মনে আশা করিয়া থাকে এই সময়টুকুর জন্য। খানিকটা সময় অন্ততঃ তাহার নিজের পাওয়া দরকার, যখন তাহাকে কাজ করিতে হইবে না, বকুনি খাইতে হইবে না, ভাইবোনদের পিছনে হৈ হৈ করিতে হইবে না, এমন কি নিদ্রার মধ্যে অচৈতন্য অবস্থাতেও কাটিয়া যাইবে না—যে সময়টা সে জাগিয়া থাকিবে, অথচ পরের ইচ্ছামত, পরের প্রয়োজনে তাহাকে চলিতে হইবে না, যে সময়টা একান্তভাবে তাহারই, যেটা লইয়া সে যাহা খুশী করিতে পারে।

অবশ্য 'যাহা খুশী' ত ভারি, অন্ধকারে ভূতের মত চারিদিক চাপা, দুর্গন্ধময় স্যাঁৎসেঁতে এই ছোট্ট উঠানটায় আসিয়া দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া একঘেয়ে ড্রেনের ঝরঝর করিয়া জল পড়িবার শব্দ শোনা, নয়ত অতি সঙ্কীর্ণ মুক্ত পথে উপরের একফালি আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা, ইহা ছাড়া আর কি-ই বা

সে করিতে পারে। কিন্তু তবু ঐটুকুই তাহার যথেষ্ট, ইহারই মধ্যে অনেকটা স্বাধীনতা আছে!

ছোট বাড়ী, তিন দিকে বড় বড় বাড়ীর দেওয়ালে ঘেরা, একদিকে অন্ধকার, ঠাণ্ডা গলি। ঘরও বেশী নয়, মোট চারখানি। একতলায় যে ঘরখানা বাহিরের দিকে পড়ে সেটাতে একদল উড়ে ভাড়াটে আছে, তাহারা সেইখানেই বাস করে এবং মুড়ি, চিঁড়া ও তেলে ভাজা খাবারের সঙ্গে কিছু চাল-ডালও সাজাইয়া দিনের বেলায় দোকান খুলিয়া বসে। ভিতরের একটি মাত্র ঘরেই পুঁটিরা সপরিবারে থাকে, আর সমস্ত দোতালাটা লইয়া থাকেন এক স্কুলের মাষ্টার।

অথচ উঁহাদেরই ঝঞ্ঝাট কম। মাষ্টার, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং দুইপক্ষের মিলাইয়া মাত্র দুইটি ছেলেমেয়ে। পুঁটি মাঝে মাঝে অবাক হইয়া ভাবে, মানুষ শুধু শুধু এত বাজে খরচ কেমন করিয়া করে! সে, তাহার বাবা, মা এবং আরও সাতটি ভাইবোনের যখন ঐ একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ঘরেই কুলাইয়া যায়, তখন চারিটি প্রাণীর জন্য দুখানি ঘরের ভাড়া গোনার কি কোন অর্থ হয়? সে একবার ইতিমধ্যে মাষ্টার-গিন্নীকে ইঙ্গিতে কথাটা বলিয়াও ছিল, মাষ্টার-গিন্নী জবাব দিয়াছিলেন, "আমার ভাই শরীর খারাপ, পাশের ঘরে একগাদা ঝামেলা সহ্য করতে পারব না। এমনিই নিচে তোমরা গোলমাল করো, তাইতেই আমার কত কষ্ট হয়। কী করব, ওঁর কুলোয় না তাই, নইলে আলাদা বাড়ীতেই আমার থাকা উচিত।"

কথাটা মনে পড়িতে অন্ধকারেই যেন পুঁটির চোখ দুইটা হিংস্র হইয়া উঠিল। চালের কথা শুনিলে তাহার গা জ্বালা করে। এ শুধু গায়ে পড়িয়া বড়মানুষি দেখানো।......দেমাক্ কত, তবু যদি বর ঢর-ঢরে বুড়া না হইত!......

পুঁটির বাবা কাজ করেন কর্পোরেশনের কী একটা কারখানায়, বেতন এতদিন পরে উনচল্লিশ টাকা আট আনায় উঠিয়াছে। সুতরাং আটটি ছেলেমেয়ে লইয়া ইহার চেয়ে ভাল ঘরের সম্ভাবনা তাঁহার নাই। পুঁটি-ই

বড়, তাহার বাপ-মা যদিও গত কয়েক বৎসর যাবতই পরের কাছে বলিয়া আসিতেছেন তাহার বয়স ষোলো, কিন্তু পুঁটি ভাল রকমেই জানে যে সে ষোলো সে বছর-ছয়েক পূর্ব্বেই পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। তবে তাহার চেহারা একটু রোগার দিকেই, তাই এখনও তাহাকে ষোলো বলিয়া চালানো যায়, তেমন 'বাড়ন-শা' গড়ন হইলে বাপ-মাকে বিপদে পড়িতে হইত।

পুঁটির এখনও যে বিবাহ হয় নাই, তাহার মোটা কারণটা অবশ্যই অর্থাভাব। এতগুলির ভরণপোষণ চালাইয়া ঐ 'আয়ে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায় না। কিন্তু সে বাধা যে একেবারেই অতিক্রম করা যাইত না তাহা নয়। দুই-একজন এমন আত্মীয় আছেন, যাহাদের কাছে গিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া পড়িলে দুই-এক-শ' আদায় হইতে পারিত। তবে সেই দুই-এক-শ'তে যে পাত্র পাওয়া যায় তাহাতে মন ওঠে না। দোজ্‌বর বরে পুঁটির ঘোরতর আপত্তি, সে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে যে, 'বুড়ো বরে' দিলে সে আত্মহত্যা করিবে। আর ঐ টাকায় যে প্রথমপক্ষ পাওয়া যায়, তাহাদের স্বভাব-চরিত্র এবং সঙ্গতি সম্বন্ধে এমন সংশয় জন্মায় যাহাতে বাপ-মায়ের মন শেষ পর্য্যন্ত সায় দিতে পারে না। তাহা ছাড়া, পুঁটি রোগা হইলেও সুস্থ ছিল, বাকী সব কয়টি ভাইবোনই কিন্তু তাহার রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য। এতগুলি রুগ্ন সন্তানের জনক-জননীর পক্ষে পুঁটিকে পরের বাড়ী পাঠানোর কল্পনাও আশঙ্কাজনক; সেইজন্যই বোধ হয় ওপক্ষে একটু শৈথিল্যও ছিল। কিন্তু পুঁটি যেন এবার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অহোরাত্র এই দারিদ্র্য ও পরিশ্রম যেন আজকাল তাহার কাছে একান্ত অর্থহীন বলিয়া ঠেকে। অকারণে বিরক্ত হইয়া ওঠে ভাইবোনদের উপর, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, রাগ করিয়া খায়না প্রায়ই। অথচ ইহার কারণ সে নিজেও খুঁজিয়া পায় না।

সহসা যেন উপরের গোঙ্গানীর শব্দটা বাড়িয়া গেল। পুঁটি কান পাতিয়া শুনিল কী যেন কথাবার্তাও হইতেছে, কিন্তু অত দূর এবং দ্বার বন্ধ বলিয়া বোঝা গেল না। অসুখ নিশ্চয় বাড়িয়াছে; এক্ষেত্রে তাহার উপরে যাওয়া উচিত কি-না বুঝিতে পারিল না। বৌ-টির বড়মানুষী চালের জন্য তাহার

রাগ যতই থাক্, কোথায় একটু সহানুভূতির সুরও ছিল পুঁটির মনের মধ্যে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, মেয়েটি সুন্দরী এবং তরুণী। সে মনে মনে সরমার বাপ-মাকে গালি পাড়ে, আহা অমন সোনার প্রতিমাকে বাপ-মা কোন্ প্রাণে ঐ ঘাটের মড়ার হাতে তুলিয়া দিল কে জানে! তাহার রাগ হয় মাস্টারটার উপরও, এই বয়সে বিবাহ না করিলে চলিত না? আর মেয়েটাই বা কী বাপু, বুড়োটাকে বিবাহ করিবার আগে বিষ খাইতে পারিল না!......

খানিকটা পরেই উপরের ঘরের কপাট খুলিবার আওয়াজ হইল। যদুনাথবাবু হ্যারিকেন হাতে বাহির হইতেছেন, বোধ হয় ডাক্তার ডাকিতে যাইবেন। সিঁড়ির মুখের কাছে আসিতেই আলোর রেখাটা পড়িল পুঁটির গায়ে। যদুনাথবাবু চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে, কে ওখানে?"

পুঁটি কোন দিন যদুনাথবাবুর সঙ্গে কথা কহে নাই। তবে না বলিবারও কোন কারণ ছিল না, তাই সে জবাব দিল, "আমি।"

তারপর একটু ইতস্তত করিয়া প্রশ্ন করিল, "দিদির অসুখ বেড়েছে বুঝি?"

যদুনাথবাবু ততক্ষণে নিচে নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, বুকের ব্যথাটা ত আছেই, আজ আবার যেন কেমন হাঁপের মত ধরেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, শুতেও পাচ্ছে না মোটে।"

তাহার পর মুহূর্তখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি যাচ্ছি ডাক্তার ডাকতে, কিন্তু একলা রইল, তাই ভাব্ছি। অবিশ্যি আমি যাব আর আসব, এই মোড়েই ডাক্তারের বাড়ী, তবু বড় ভয় করে—"

পুঁটি কহিল, "আমি গিয়ে বসব একটু?"

যদুনাথবাবু কহিলেন, "তা হ'লে ত ভালই হয়। আমি এখনই ফিরব, এই মোড়েই"—

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। পুঁটি ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। সামনের ঘরেই মেঝেতে একটা বিছানার উপর বসিয়া সরমা কাত্রাইতেছিল; তাহার কোলের উপর একটা তাকিয়া দেওয়া, যন্ত্রণায় বেচারীর মুখ নীল হইয়া উঠিয়াছে।

সেইখানে বসিয়া পড়িয়া পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল, "বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে দিদি?"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে সরমা জবাব দিল, "আজ মোটে নিঃশ্বেস নিতে পারছি না, যেন দম আটকে আসছে"—

চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া এ যন্ত্রণা দেখাও কষ্টকর। পুঁটি একটা পাখা তুলিয়া লইয়া কহিল, "একটু বাতাস করব দিদি মাথায়? তাতে আরাম বোধ হবে মনে হচ্ছে?"

সরমা কথা কহিতে পারিল না, ইঙ্গিতে নিষেধ করিল।

অগত্যা পুঁটিকে চুপ করিয়াই বসিয়া থাকিতে হইল। সে তখন ঘাড় ঘুরাইয়া ঘরের আসবাব-পত্র দেখিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে এই মেয়েটির চালের জন্যও বটে, আর সমায়াভাবের জন্যও বটে, আর কোন দিন সে উপরে ওঠে নাই। আলাপ যা হইত উভয় পক্ষে, একজন থাকিত উপরের বারান্দায়, নয়ত সিঁড়ির মুখে, আর একজন থাকিত নিচের উঠানে। আজ সে মাস্টারের গৃহস্থালী দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। মাত্র দুটি লোকের সংসারে যে এত আসবাব থাকিতে পারে, তাহা যেন তার কল্পনাতেই আসে না। আয়না-বসানো আলমারী, আলনা, দেরাজ, বাক্স, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ, টেবিল, ঘড়ি আরও কত কি। এত জিনিস লইয়া ইহারা করে কি?

দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ তাহার চোখ আসিয়া পড়িল আবার সরমার উপর। কয় মাস হইতে অসুখে ভুগিয়া তাহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে বটে, তবু তাহাকে এখনও সুন্দরীই বলা যায়। আশ্‌মানী রঙের কাপড়টি তাহাকে মানাইয়াছে ভালই। গহনাও খুব কম নাই, চুড়ি, বালা, আর্ম্মলেট, হার, আরও কত কি! মেয়েটি সর্ব্বদাই সাজিয়া গুজিয়া থাকিত, আর সেই জন্যই উহার অত দেমাক—। মাগো, অমন কাপড়-গহনাতে কাজ নাই, বর ত ঐ ঘাটের মড়া।......দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া বুড়োটাও কম জব্দ হয় নাই, ইহার বাবুয়ানা জোগাইতে গিয়া ইস্কুলের পরও রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ছেলে পড়াইতে হয়।

সরমাকে দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ গেল আয়নাতে প্রতিফলিত নিজের চেহারার দিকে। যেমন কালো, তেমনি রোগা—আর তেমনি শ্রীহীন।

গায়ে কোথাও এক কোঁটা সোনা নাই, কবে কোন মান্ধাতার আমলে ব্রোঞ্জের উপর সোনার পাতমোড়া চুড়ি তৈয়ারী হইয়াছিল, অতিরিক্ত ক্ষইয়া যাওয়াতে বাধ্য হইয়া খুলিয়া রাখিয়াছে, এখন শুধু কাঁচের চুড়ি ভরসা। পরনের কাপড়খানা পর্য্যন্ত কুৎসিত, মোটা মিলের কাপড়, তাও খাটো হয়।

তাড়াতাড়ি সেদিক হইতে চোখ ফিরাইতেই হ্যারিকেনের আলোতে সরমার হাতের চুড়িটা ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি চোখ বুজিল।

ইতিমধ্যে যদুনাথবাবু ফিরিয়া আসিলেন। পুঁটি প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই। তাহা হইলে ডাক্তার আসিবার আগেই সে নামিয়া যাইত, কিন্তু এখন আর তাহার অবসর মিলিল না। অগত্যা সঙ্কুচিতভাবে পাশের ঘরের দ্বারপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। অন্যদিন নিজের রূপ বা সজ্জার দৈন্যের কথা তাহার মনেই থাকে না। কিন্তু আজ যেন অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিতেছিল।

ডাক্তার আসিয়াই ইঞ্জেক্‌সনের সরঞ্জাম বাহির করিলেন, কহিলেন, "একটু গরম জল চাই যে—"

যদুনাথবাবু অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাহিতেই পুঁটি কহিল, "কাগজ জেলে গরম করে দেব ?"

যদুনাথবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, "কাগজ জ্বালতে হবে না, ওঘরে তাকের ওপর স্টোভ আর স্পিরিট আছে, একটা বাটি-ফাটি ক'রে চাপিয়ে দাও—"

পুঁটি পাশের ঘরে গেল বটে, কিন্তু জলটা কি উপায়ে গরম হইবে, ঠিক বুঝিতে পারিল না। স্টোভ বস্তুটির সহিত তাহার পরিচয় ছিল না, ইতিমধ্যে একবার মামার বাড়ী গিয়া দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু জ্বালিবার কৌশলটা জানিত না। অথচ যদুনাথবাবুকে কথাটা বলিতেও তাহার অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইল, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

কিন্তু যদুনাথবাবুই কী একটা কাজে আসিয়া পড়িলেন, উহাকে ঐ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "ও, স্টোভ বুঝি জ্বালতে পারো না ? আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি জেলে দিচ্ছি—"

তিনি স্টোভটা ধরাইয়া দিয়া গেলেন, নিভাইবার কৌশলটাও বলিয়া দিলেন। কিন্তু পুঁটি লজ্জায় যেন মরিয়া গেল, জলটা গরম হইতে বাটিটা ডাক্তারের সামনে বসাইয়া দিয়া কোনমতে পাশ কাটাইয়া নিচে নামিয়া আসিল এবং একেবারে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। যদিচ শুইয়াও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, বিছানায় পড়িয়া বার বার নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

পরের দিন পুঁটির ঘুম ভাঙ্গিল বেলায়। চোখ চাহিতেই তাহার প্রথম যে জিনিষটি চোখে পড়িল, তাহা তাহাদের সংসারের অপরিসীম শ্রীহীনতা! মা এত বেলা অবধি ঘুমাইবার জন্য কলতলা হইতেই চীৎকার করিতেছেন; তখনও পর্য্যন্ত বিছানা তোলা হয় নাই, তক্তপোশের উপর, মেঝেতে সর্ব্বত্র ময়লা ও ছেঁড়া কাঁথা ছড়ানো; একটা ভাই আর একটা ভাইকে ঠেঙ্গাইয়াছে বোধ হয়, সে বাটির তেলমাখা মুড়িগুলা বিছানায় ছড়াইয়া দিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগ্নীটি হামা দিয়া আসিয়া তাহার বাবার বিছানাতেই মলত্যাগ করিয়াছে, তাহার দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে; যেটুকু মেঝে খালি আছে, তাহাও জলে-কাদায় যেন নরকে পরিণত হইয়াছে। সেদিকে চাহিয়া পুঁটির সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, তাহার পর নিষ্ফল ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "মর, মর, তোরা।...সবক'টা একসঙ্গে মরে ত বাঁচি।"

সেদিন আর সে উপরে উঠিল না। বার বার ডাক্তারের আগমনে বোঝা গেল যে অসুখটা খারাপের দিকেই, তবুও সে খবর লইতে গেল না।

এমন কি, সরমাদের ঠিকা ঝি'কে যদুনাথবাবু পয়সার লোভ দেখাইয়া রাত্রে থাকিতে রাজি করাইয়াছেন, এই কথাটা ঝি যখন নিজেই শুনাইয়া গেল, তখনও কোন কথা কহিল না।

কিন্তু তাহার পরের দিন যখন ঝি ছেলেমেয়ে দুটিকে অপটুহস্তে স্নান করাইতে বসিয়াছে এবং তাহার ফলে সরমার মেয়েটা ভীষণ চীৎকার করিতেছে কানে গেল, তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। সটান্ উপরে উঠিয়া

গিয়া ঝিকে সরাইয়া দিয়া নিজেই মেয়েটাকে স্নান করাইয়া দিল। তাহার পর পরিপাটিভাবে তাহার প্রসাধন শেষ করাইয়া নিজেই ঠাকুরের কাছে ভাত চাহিয়া লইয়া খাওয়াইতে বসিল। মেয়েটাও তাহার কোলে উঠিয়া আশ্চর্য্যরকমভাবে শান্ত হইয়া গেল; সরমা হাঁফাইতে হাঁফাইতে একবার দম লইয়া কহিল, "বাঁচলুম ভাই, চেঁচিয়ে যেন বাড়ী মাথায় করছিল!"

উহাদের খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া যখন পুঁটি নীচে নামিয়া আসিল, তখন তাহার মা একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়াছেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ, তাই শুনি! ডেকে ডেকে গলা কাঠ হয়ে গেল!"

পুঁটি শুধু কহিল, "ওপরে গিয়েছিলুম।"

"কেন ওপরে যাস্! আমার নিজের কুকুর পথ্যি পায় না, উনি যান পরের উপকার করতে!"

পুঁটিও ঝাঁঝের সহিত জবাব দিল, "তোমার ও শুয়োরের পাল ত বারোমাসই আছে মা, পাড়া-পড়শীকেও দেখতে হয় মাঝে মাঝে!

মা তাহার জবাবে চীৎকার করিয়া কী একটা কটূক্তি করিয়া উঠিলেন, কিন্তু পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াইল না, অন্য কাজে চলিয়া গেল।

ইহার পর হইতে পুঁটি সম্পূর্ণরূপে ছেলেমেয়ে দুইটির ভার গ্রহণ করিল। তাহাদের নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, সব—ঝি'কে আর কিছুই করিতে দেয় না। যদুনাথবাবু কৃতজ্ঞভাবে স্ত্রীকে বলেন, "মেয়েটাকে আগে 'ঝগড়াটি' বলেই জানতুম, এখন দেখছি অনেক গুণ আছে ওর মধ্যে!"

সরমা অতি কষ্টে জবাব দেয়, "বাপ-মা যা দিনরাত খাটায়, ঝগড়াটি না হয়ে কি ক'রে বলো!"

কিন্তু সরমা বাঁচিল না। সাত আটদিন পরেই অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল, আরও দিন-দুই পরে সব শেষ। যদুনাথবাবুর এক দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী আসিয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং পুঁটির আর বিশেষ দরকার ছিল না, তবু সে এ কয়দিন অযাচিতভাবে আসিয়া সরমার অনেক সেবা করিয়াছে। সরমা মৃত্যুর পূর্ব্বে

যত্নুনাথবাবুকে বলিয়া গিয়াছে, "আহা ও মেয়েটার একটা দেখেশুনে বিয়ে দিয়ে দিও। না হয় ছু-একখানা গয়না যা লাগে, আমার একখানা ভেঙ্গে গড়িয়ে দিও—"

ইহার পর অশৌচ চুকিতেই যত্নুনাথবাবু উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এ বাসায় তাঁহার আর থাকিতে ইচ্ছা করে না।

যে ভগ্নী আসিয়াছেন, তাঁহারই পাশের বাড়ীতে ঘর খালি আছে, আপাততঃ সেখানেই উঠিয়া যাইবেন। তাহা হইলে ছেলেমেয়ে ছুটির জন্য বিশেষ ভাবিতে হইবে না; দিদি বা দিদির পুত্রবধূই দেখাশুনা করিতে পারিবেন।

রবিবার দিন সকাল হইতে বাঁধা-ছাঁদা, তোড়জোড় শুরু হইল। আহারাদির পর দিদি ছেলেমেয়েদের লইয়া নূতন বাসায় চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের গাড়ীতেও অনেক মোটঘাট চলিয়া গেল। এখন আলমারী, দেরাজ, সিন্দুক প্রভৃতি ভারী জিনিষগুলি বাকী।

মুটে ডাকিয়া যত্নুনাথবাবু সেগুলির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এ কয়দিন অর্থাৎ সরমার মৃত্যুর পর হইতে পুঁটি আর উপরে ওঠে নাই, এমন কি ছেলেমেয়ে ছুটাকেও একবার ডাকে নাই। তাহার এই নিস্পৃহতায় যত্নুনাথবাবু একটু বিস্মিতই হইয়াছিলেন, তবে মনকে বুঝাইয়াছিলেন যে, বোধ হয় পরের ছেলেমেয়েদের উপর মায়া পড়িবার ভয়েই আর আসে না। কিংবা বাপ-মা হয়ত নিষেধ করিয়াছেন—

কিন্তু সেদিন সহসা [illegible] পুঁটি উপরে উঠিয়া গেল। যত্নুনাথবাবু তখন আলমারী খুলিয়া সরমার দামী সাড়ীগুলি বাহির করিয়া একটা ঝুড়িতে সাজাইতেছিলেন, আলমারী খালি না হইলে মুটেরা লইয়া যাইতে পারিবে না। পুঁটি আসিতে তিনি একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। পুঁটিও সেই শাড়ীর স্তূপগুলির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। বেনারসী, জর্জ্জেট, ঢাকাই, শান্তিপুরী, ক্রেপ, আরও কত কি! কত কাপড় কিনিয়াছিল মেয়েটা!

শুধু কি কাপড়! একটা তাক বোঝাই কত শৌখীন খেলনা, রূপার বাসন আরও কত কি। বৃদ্ধ স্বামীর গায়ের রক্ত জলকরা পয়সা কি অপব্যয়ই না করিত।......

পুঁটি পিছন হইতে একবার যদুনাথবাবুর দিকে ভাল করিয়া চাহিল। না, যতটা বৃদ্ধ তাঁহাকে সে ভাবিত অতটা নয়। চুলে পাক ধরিয়াছে বটে, তবে সবগুলি এখনও পাকে নাই, দেহ এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ আছে—

মুটেরা আলমারী লইয়া চলিয়া গেল। তিনি তখন দেরাজ খুলিয়া তাহার টানাগুলি খালি করিতে লাগিলেন। সেখানেও এক গাদা কাপড়-জামা। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ যেন পুঁটির চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল।......

সে আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া কহিল, "ছেলেমেয়ে দুটোর ভারী অসুবিধে হবে—"

যদুনাথবাবু প্রথমটা যেন চমকিয়া উঠিলেন, তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তাই ত ভাব্‌ছি। কিন্তু কীই বা করি।"

পুঁটি একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনাকে শিগ্‌গিরই বিয়ে করতে হবে আর কি!"

যদুনাথবাবু চকিত হইয়া কহিলেন, "আবার বিয়ে?"

পুঁটি বেশ সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, "তা করতে হবে বৈকি! না হ'লে ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখবে কে?"

যদুনাথবাবু কহিলেন, "কিন্তু এই বয়সে আবার—তৃতীয় পক্ষ! লোকে বলবে কি?"

"লোকে ত আর আপনার ছেলেমেয়ে মানুষ করতে আসবে না! আর এমন কীই বা বয়স আপনার!"

যদুনাথবাবু অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন, "কিন্তু কে-ই বা মেয়ে দেবে আমাকে? দুটো ছেলের ওপর, তায় তৃতীয় পক্ষ! বয়সও ত পঞ্চাশ হ'ল প্রায়।"

পুঁটি সহসা যেন মরীয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিল, "আমাকে যদি খুব অপছন্দ না হয় ত আমি রাজি আছি। বাবাকে বলতে পারেন।"

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত চাহিয়া থাকিয়া যদুনাথবাবু কহিলেন, "তুমি বিয়ে করবে? আমাকে?······কিন্তু তোমার বাবা-মা রাজি হবেন কেন?"

পুঁটি ঘাড় হেঁট করিয়াই জবাব দিল, "না হয়ে আর করবেন কি? বয়স যে এধারে তেইশ চলছে। তাছাড়া, ছেলেমেয়ে দুটোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।"

সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যদুনাথবাবু তেম্‌নিভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শিল্পী

রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া উপরে যাইবার পথে সহসা উর্ম্মিলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে একটা চাপা আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, কিন্তু তবু শব্দটা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই, সেটা সেতারেরই গুঞ্জন। অসহ্য ক্রোধে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু দুটি দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। সে আশা করিয়াছিল যে, অত কঠিন তিরস্কারের পর তাহার স্বামী অন্তত উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হইবে, কিন্তু সে আশাও তাহার স্বামী সম্বন্ধে অজ্ঞতায় পরিণত হওয়ায় নিষ্ফল ক্রোধের দাহনটা তাহাকেই নিঃশব্দে পোড়াইতে লাগিল।

আশ্চর্য্য, অত মধুর একটা বাদ্যযন্ত্রের উপর সুনিপুণ হাতের মধুরতর কারিগরি মানুষের গায়ে এত বিষ ছড়াইতে পারে! অথচ এমনি কানে যাইবার কথাও নয়। একে ত রাজশেখরের হাতে সেতার কোনদিনই কলরব করে না, তাহার উপর সে বোধ করি উর্ম্মিলারই ভয়ে, ভিতরের দিকের সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বসিয়াছে। যেটুকু শব্দ তবুও রুদ্ধদ্বার ভেদ করিয়া ভিতরে পৌঁছিতেছে, সেটা অন্য কোন শব্দ হইলে বোধ হয় উর্ম্মিলা শুনিতে পাইত না। কিন্তু সেতারটা জলাতঙ্কের মত ব্যাধিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিয়াই, অতি ক্ষীণ আওয়াজও তাহার কানে গেল। আজকাল সেতারের আভাস মাত্রেও সে যেন পাগল হইয়া উঠে।

অথচ কিছুদিন আগেও এমন ছিল না। মনে আছে, তাহার ফুলশয্যার দিন রাত্রেই সমস্ত লোকলজ্জা ও উপহাসের ভয় উপেক্ষা করিয়া রাজশেখর তাহাকে সেতার বাজাইয়া শুনাইয়াছিল। সেদিন যে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের ভাব তাহার মনের মধ্যে জাগিয়াছিল, প্রথম কৈশোরের সে মোহ বহুদিন তাহার মন হইতে যায় নাই। তারপর বহুকাল, বহু বৎসর সে বিস্ময়, সে শ্রদ্ধা তাহার ছিল অবিচলিত। সে স্বামীর কাছে কোনদিন অলঙ্কার চায় নাই, ভাল বস্ত্র চায় নাই—সমস্ত অভাব, সমস্ত কষ্ট সে হাসিমুখে সহিয়াছিল ঐ সেতারেরই মোহে। প্রতিদিন রাত্রে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজশেখর যখন শুধু তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বাজাইয়া যাইত, তখন সমস্ত শারীরিক কষ্ট এবং অভাবের কথা সে ভুলিয়া যাইত। কঠিনতম অপমানের বেদনাও সুরের আঘাতে অশ্রুর আকারে তাহার দুটি সুন্দর গণ্ড বাহিয়া নামিয়া আসিত, সে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু শিল্পীর ভাবসুন্দর চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া থাকিত, আর কোন কথাই মনে আসিত না।

কিন্তু সে মোহও একদিন কাটিল বৈকি!

শ্বশুরের রাখিয়া যাওয়া জমিগুলি সমস্তই যখন একে একে বিক্রয় হইয়া গেল, সত্য সত্যই যখন একাদিক্রমে দুই তিন দিন অনশনের পর একবেলা আহারও ভাল করিয়া জোটা ভার হইল, পথ্য এবং চিকিৎসার অভাবে তাহার অমন ফুলের মত সুন্দর ছেলে টুন্‌টুন্ শুকাইয়া মরিল, তখন আর ধৈর্য্য রাখা উর্ম্মিলার পক্ষেও অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজশেখরের তবু চৈতন্য হইল না। সে ঠিক আগের মতই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া সুরের সাধনাই করিয়া যাইতে লাগিল। উর্ম্মিলার অভিমান, অশ্রুজল, অনুনয় শেষে অনুযোগ পরে কঠিন তিরস্কারে পরিণত হইল তবু রাজশেখর রহিল অবিচলিত। উর্ম্মিলার বাক্যবাণ যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত তখন সে বাহিরে কোথাও নিজের তিন-চারিটি সেতারের যে কোন একটিকে লইয়া বসিত বাজাইতে।

সবচেয়ে উর্ম্মিলার দুঃখ এই যে, সে ইচ্ছা করিলে উপার্জ্জনও করিতে পারে। অন্তত ট্যুইশনীর ত অভাব হয় না, অনেকেই তাহার কাছে বাজনা

শিখিতে চায়, কিন্তু রাজশেখর সে কথা শুনিলেই জ্বলিয়া ওঠে। বলে, "হ্যাঁ পাঁচটা কি দশটা টাকা দিয়ে আমার মাথা কিনে নেবে একেবারে! গুরুদত্ত জিনিস, যা পাবার জন্যে আমায় সারাজীবন সাধনা করতে হ'লো, তা আমি ঐ কটা টাকায় বিক্রী করতে পারব না।···তাছাড়া ঐ সব ভোঁতা আর গাধা ছোঁড়াগুলোর সাধ্যি নেই যে এ যন্ত্র বাজাতে শেখে, মিছিমিছি ওদের পেছনে খেটে আমার শুদ্ধ হাত খারাপ হয়ে যাবে।"

মাঝে মাঝে দূর দেশ হইতে ডাক আসে বাজাইবার, তাহারা টাকাও দিতে চায়, কিন্তু রাজশেখর তাহাতেও রাজি হয় না। বলে, "তালকানার আসরে শোনাবার জন্যে আমার এ বিদ্যে শেখা হয় নি মিলি, ও আমি পারব না! হ্যাঁ পাঁচটা গুণীজ্ঞানীর আসর হোক, আলবাৎ যাবো।"

কিন্তু 'গুণী-জ্ঞানী'র আসরে টাকা মেলে না, যদিবা মেলে, সে শুধু গাড়ী-ভাড়াটা।

অবশ্য টাকা যে একেবারে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। মধ্যে মধ্যে কলিকাতার বড় বড় দোকানদাররা দামী সেতার পাঠাইয়া দেন পরীক্ষা করিতে, কিসের অভাবে যথেষ্ট মিষ্টসুর বাহির হয় না তাহাই জানিতে। সে সব ব্যাপারে যন্ত্রটা ঠিক করিয়া দিয়া পাঁচ দশটা টাকা পাওয়াও যায়, কিন্তু সে টাকা পরক্ষণেই তাহার নিজের সেতারের পিছনেই ব্যয় হইয়া যায়, উর্ম্মিলার হাতে একটাও পড়ে না।

অথচ, সে সবই জানে। টাকার জন্য পাওনাদাররা যে উর্ম্মিলাকে লাঞ্ছনা করিয়া যায় তাহা রাজশেখর নিত্যই বসিয়া বসিয়া দেখে, তবু টাকা বস্তুটির অত্যাবশ্যকতা তাহার মাথায় ঢোকে না। কী করিয়া মানুষ যে এত নির্ব্বিকার হয় তাহা আজও উর্মিলা বুঝিতে পারে না। এই ত আজই মুদীর দোকানের লোকটা তাহাকে কী পর্য্যন্ত না অপমান করিয়া গেল! আর তাহারই বা অপরাধ কি, আড়াইশ' টাকার উপর তাহার পাওনা। নেহাৎ দুই পুরুষের লেন-দেনের সম্পর্ক বলিয়াই এতদিন সে চুপ করিয়া আছে।···সে লোকটা যখন উর্ম্মিলাকে গালিগালাজ করিতেছিল তখন রাজশেখর ভিতরে বসিয়া একটা সেতারে তার

চড়াইতেছে। অথচ সে না বলিল একটি কথা, না আসিল বাহিরে। বরং সে লোকটা চলিয়া গেলে ভিতর হইতে হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, সে আপদটা গেছে মিলি?

এ প্রশ্নেই উর্ম্মিলা হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়াছিল। ভিতরে গিয়া অসহ্য ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়াছিল, "ঐ কথাটা জিজ্ঞেস করতে একটু লজ্জা হ'লো না তোমার? ছি ছি, তুমি মানুষ না জানোয়ার? নিজের স্ত্রীকে পাওনাদার অপমান ক'রে যায় যার, সে কী ক'রে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, আবার দাঁত বার ক'রে হাসে?······হাড়ি-মুচি ডোম হ'লেও সহ্য করতে পারত না, তারা নিজেরা মার খায় কিন্তু ঘরের মেয়ের ইজ্জত তাদেরও আছে। আমার মাথা-মুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে···ছি!···এত লোকের মরণ হয়, তোমার হয় না? তবু বিধবা হ'লে লোকের দয়া পেতুম, ভিক্ষে ক'রে খেতুম লোকের বাড়ি, নয়ত গতর খাটাতুম, সে-ও এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল!"

রাজশেখর এতক্ষণ মাথা নত করিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল। শেষের কথাটায় মুখ তুলিয়া আহত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছ, মিলি?"

ক্রোধে জ্ঞান হারাইলে প্রকৃতিস্থ হইতে বিলম্ব হয়। উর্ম্মিলা তেমনি ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিল, "হাঁ! তোমার মত স্বামী বেঁচে থেকে লাভ কি!"

রাজশেখর আর কথা বলে নাই, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল মাত্র। কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উর্ম্মিলার অনুতাপের সীমা ছিল না। ছি ছি, এ কি করিল সে! কেমন করিয়া একথা সে মুখে আনিল! এই রকম মর্ম্মান্তিক আঘাতেই লোকে আত্মহত্যা করে, যদি সেই রকমই একটা কিছু করিয়া বসে রাজশেখর? স্ত্রীর মুখ হইতে এমন কঠিন কথা শুনিলে সেইটাই স্বাভাবিক।···

অনুতাপে, দুশ্চিন্তায়, ক্ষোভে উর্ম্মিলার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। তাহার উদ্বেগের সীমা রহিল না। একথা যদি কেহ শোনে তাহা হইলেই বা কি বলিবে লোকে, তাহাকেই সকলে দোষ দিবে যে! স্বামীর মৃত্যু কামনা—না সে কোনমতে কোনদিনই তাহা করিতে পারিবে না।···

অনেকক্ষণ রান্নাঘরে চুপ করিয়া একা বসিয়া থাকিয়া সে কী একটা কাজের অছিলায় উঠিয়া পড়িল। মনের মধ্যে আসল কথাটা ছিল বোধ হয় রাজশেখরের খবর লওয়াই কিন্তু বাহিরে পা দিয়াই তাহার সমস্ত বেদনা, সমস্ত উদ্বেগ নিমেষে একটা অসহনীয় উন্মাদ ক্রোধে পরিণত হইল। হায়রে! এই লোকটিরই আত্মহত্যার আশঙ্কা করিতেছিল সে! অতি বড় নির্লজ্জ যে তাহারও হয়ত এক সময়ে অপমান বোধ হওয়া সম্ভব, কিন্তু এ যে একেবারে পাথর—কোন আঘাত কোনদিনই সে পাষাণ ভেদ করিয়া একবিন্দু সম্মানবোধ বাহির করিতে পারিবে না। আত্মসম্মানের লেশমাত্র নাই এমন মানুষ কি করিয়া হয়!

উর্ম্মিলা উপরের শয়ন কক্ষে আসিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। চোখের জল তাহার শুকাইয়া গিয়াছে, সে ছিল দুঃখের প্রথম স্তর। আজ আর চোখে জল আসে না। শুধু যেন আগুন বাহির হয়। একটা উন্মাদ অন্ধ ক্রোধে সে পাগলের মত বিছানায় মুখ ঘষিতে লাগিল। ইহার কি কোথাও কোন প্রতিকার নাই? কিছুতেই কি ঐ পাথরকে বিচলিত করা সম্ভব নয়?......

একটা ছেঁড়া বালিশ হইতে অনেকদিন ধরিয়াই কিছু কিছু তুলা বাহির হইতেছে। সেলাই করার অবস্থাও আর তাহার নাই। তাহারই কয়েকটি তুলার ডেলা উর্ম্মিলার কপালের ঘামের সহিত জড়াইয়া গেল। সেগুলোকে ঘষিয়া তুলিতে গিয়া তাহার নজরে পড়িল বালিশটা—সে দুই হাতে সেটাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ঘরময় তুলা ছড়াইয়া দিল। রাগে সে সত্যই তখন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল এই সমস্ত বিছানা সে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। বাড়ি-ঘরে আগুন লাগাইতে পারিলে সে আরও খুশি হইত—কিন্তু তাহাতে শুধু মহাজনেরই ক্ষতি হইবে, যে শুধু দুর্দ্দিনে টাকা ধার দিয়াছে নামমাত্র সুদে—রাজশেখর একবার বোধ হয় ফিরিয়াও চাহিবে না।......

উর্ম্মিলা পাগলের মত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। ইহার প্রতিকার হওয়া চাই-ই, যেমন করিয়াই হউক। তাহার ছেলে অনাহারে

মরিয়াছে—কোলের মেয়েটিও তিলে তিলে শুকাইয়া মরিতেছিল, মেয়ের মাসী ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গিয়াছে। সে-ও গরীব তবু হয়ত মেয়েটাকে সে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু কেন, কেন উর্ম্মিলা এ অত্যাচার সহ্য করিবে। কেন কোলের মেয়েকে পরের কাছে পাঠাইয়া বন্ধ্যার মত থাকিবে সে?…ঐ নির্ম্মম, স্বার্থপর, আত্মসর্ব্বস্ব লোকটির জন্য কিছুতেই সে এমন করিয়া অপমানের পঙ্কে ডুবিয়া থাকিতে পারিবে না, তিলে তিলে আত্মহত্যা করা আর তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সে নির্ব্বোধ তাই এতদিন রাজশেখরের প্রেমে বিশ্বাস করিয়াছিল, ঐ লোকটি শুধু একটি মাত্র বস্তুকে এতদিন ধরিয়া ভালবাসিয়াছে, সে তাহার সেতার। আর সে-ও ত আত্মপরতারই নামান্তর মাত্র।…তাহার জন্য মিছামিছি সকলে মিলিয়া এমন করিয়া লাঞ্ছনা দুঃখ ভোগ করিবে কেন?

না, আর নয়।

আরও কিছুক্ষণ এমনি উন্মত্ত ক্রোধে ছট্‌ফট্ করিবার পর উর্ম্মিলার মনে পড়িল, সে রান্নাঘরে ডাল চাপাইয়া আসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া দেখিল, ডালের জল মরিয়া সমস্তটা পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছিল, সে কয়লাও পুড়িয়া এখন ছাই হইয়াছে। কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া সে উনানের আঁচ নামাইয়া দিল, আজ আর সে রাঁধিবে না, রান্না করা এ মানসিক অবস্থায় সম্ভব নয়। হউক জব্দ, ক্ষুধার অন্ন না পাইয়া অন্তত একটু শারীরিক কষ্ট সহ্য করুক।

সে উপরে আসিয়া আঁচলটা বিছাইয়া মেঝেতে শুইয়া পড়িল। ছেঁড়া বালিশটার তুলা ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতেছে, অন্য সময় হইলে উর্ম্মিলা কিছুতেই এ নোংরামি সহ্য করিতে পারিত না কিন্তু আজ সে জোর করিয়া পড়িয়া রহিল। এ সংসারের জন্য এতটুকু পরিশ্রমেও আর তাহার রুচি নাই। এমন সময়ে কাজকর্ম্ম ফেলিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকাও তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব, বিশেষতঃ সেই অপরিসীম মানসিক গ্লানির মধ্যে, তবু সে প্রাণপণ চেষ্টায় শুইয়া রহিল। রাজশেখর বুঝুক একটা দিন যে, হাতের কাছে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ঠিকমত না পাইলে শুধু সেতারে দিন চলে কি না।

কিন্তু সত্যই কি রাজশেখর বুঝিবে? হয়ত সে একটু পরে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে। কোন বন্ধুর বাড়ি এ বেলাটা কাটাইয়া আবার সন্ধ্যায় আসিয়া সেতার লইয়া বসিবে। নিজেও খাইবে না উর্ম্মিলাকেও অনুরোধ করিবে না। এই নিরুপদ্রব অসহযোগের কাছেই ত উর্ম্মিলাকে বার বার হার মানিতে হইয়াছে।

অথচ কীই-বা করা যায়? এমন একটা আঘাত রাজশেখরকে দিতে হইবে যাহাতে পাষাণও প্রাণ পায়। পাষাণ না গলে দুঃখ নাই, আঘাতে আগুন বাহির হইলেও উর্ম্মিলা খুশি হইত। সে যদি এমনভাবে চুপ করিয়া না থাকিয়া উর্ম্মিলার সহিত কলহ করিত, এমন কি মার ধোরও করিত তবুও হয়ত এত দুঃখ হইত না তাহার। এই কুৎসিত আত্মাবমাননাকর ঔদাসীন্যের অপেক্ষা সে ঢের ভাল ছিল।......

উন্মত্ত ক্রোধ ক্ষয় হইবার উপায় না পাইলে ক্রমাগত হিংস্রতাই বাড়ায়। নিষ্ফল রোষে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিবার পর অকস্মাৎ এক সময়ে উর্ম্মিলার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে একেবারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু তবু যে কল্পনা আভাসে মাত্র দেখা দিয়াছে তাহার হিংস্রতা এতই উগ্র যে সে নিজেই যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে যে রাজশেখরকে এতবড় আঘাত দিবার কথাটা কল্পনা করিতে পারিয়াছে—সে কথাটা সম্পূর্ণ ধারণা করিতেই তাহার কিছু সময় লাগিল।

কিন্তু হউক হিংস্র, তবু এই-ই তাহার একমাত্র পথ। রাজশেখর বাহির হইয়া গেলে সেতারগুলো সে আজ ভাঙ্গিয়া দিবে!

সামান্য ক্ষতি নয়, একেবারে গুঁড়াইয়া শেষ করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে আর কোনদিনই, কোন রকমে তাহাদের সারানো না যায়।

পৃথিবীর সমস্ত কিছুর দিকে পিছন ফিরিয়া, দয়া-মায়া-ভালবাসা, সম্মানবোধ সব বিসর্জ্জন দিয়া সে একমাত্র যাহাকে অবলম্বন করিয়াছে, তাহাকেই নষ্ট করিয়া মূলে আঘাত করিতে হইবে। তিল তিল করিয়া সে এই সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, নিখুঁত করিয়াছে—সেই সমস্ত স্বপ্ন,

অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকে একই আঘাতে ধূলিসাৎ না করিতে পারিলে চলিবে না, আর কোন পথ, কোন উপায় খোলা নাই উর্ম্মিলার চোখের সামনে।

রাজশেখরের মুখের চেহারাটা কল্পনা করিয়া এক প্রকারের হিংস্র আনন্দে উর্ম্মিলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।—তখনও নিস্পৃহ থাকিতে পারিবে কি সে? সেইটাই উর্ম্মিলা দেখিতে চায়।

হয়ত পাগল হইয়া যাইবে। এই রকম আকস্মিক আঘাতেই মানুষ পাগল হয়, কিংবা হয়ত রাগে জ্ঞান হারাইয়া উর্ম্মিলাকে প্রহারই করিবে। চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করাও বিচিত্র নয়। কিন্তু পরিণাম যাহাই হউক, উর্ম্মিলা তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। রাজশেখর যদি রাগের চোটে উর্ম্মিলাকে হত্যা করে তাহাতেও আনন্দ পাইবে উর্ম্মিলা, বুঝিবে তবু এতটুকু পৌরুষ অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে—

উর্ম্মিলা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে উত্তেজনায় স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। আর এক মুহূর্ত্তও দেরি সহিতেছিল না তাহার। রাজশেখর কি আছে এখনও?

পা টিপিয়া টিপিয়া যেন কিসের একটা আশঙ্কায় সে নিঃশব্দে নামিয়াআসিল। রাজশেখর সত্যই বাহির হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে একবার। তাহার পর ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

স্বামীকে উর্ম্মিলা ভাল করিয়াই চেনে। এ বেলা আর রাজশেখর ফিরিবে না, স্বচ্ছন্দে সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় কোথাও আড্ডা দিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার সেতার লইয়া বসিবে। যদি তিন দিন উর্ম্মিলা রান্না না করে, তবু এই ধারার ব্যত্যয় ঘটিবে না।......

সে বাহিরের ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। বহু দিন, বোধ হয় দুই বৎসর সে এ ঘরে ঢোকে নাই। আগে বন্ধু-বান্ধবরা চলিয়া গেলে রাজশেখর তাহাকে এই ঘরেই ডাকিয়া বসাইয়া বলিত, "হাঁ রাণীজী, আব্ আপ্ ফরমাইয়ে! কোন্‌টা বাজাবো বলো—"

সে হাত দিয়া তিনটা সেতার দেখাইয়া দিত। তাহার পর উর্ম্মিলার নির্দ্দেশ মত একটা টানিয়া লইয়া বাজাইতে বসিত—গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চলিত তার বাজনা, একটি মাত্র শ্রোত্রীকে উপলক্ষ্য করিয়াই। কোন-কোন দিন, গরমের দিন বিশেষ করিয়া, ছাদে গিয়াও বসিত।……

উর্ম্মিলার অজ্ঞাতে একটা নিঃশ্বাস পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। না, দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে চলিবে না। সে কতকটা জোর করিয়াই চাহিয়া দেখিল, ইস্—কী নোংরাই হইয়া আছে বাহিরের ঘরটা। শতরঞ্চিটা শত ছিন্ন, তাহার উপর ধুলাই জমিয়া আছে বোধ হয় এক ইঞ্চি। মধ্যে মধ্যে রাজশেখর নিজেই ঘরটা পরিষ্কার করে উর্ম্মিলা জানিত; কিন্তু সে যে এই পরিষ্কার করা—তাহা সে জানিত না। রাজশেখর নিজে বিড়ি খায় না, কিন্তু অভ্যাগতদের পরিত্যক্ত বিড়ি ও সিগারেটের কুচি বোধ হয় লাখ-খানেকেরও বেশী মেঝেতে ছড়ানো আছে। ছি ছি, কলিকাতা হইতে যে-সব লোক আসে, তাহারা কি মনে করে! মনে মনে নিশ্চয় উর্ম্মিলাকেই দোষ দেয়। না, এ রোগের আজই শেষ করিতে হইবে।

সে তক্তাপোশের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সর্ব্বাপেক্ষা দামী সেতার যেটি, সেইটিই পাড়িয়া লইল। আগাগোড়া হাতীর দাঁতে সমস্তটা বাঁধানো—আকৃতিও ইহার যেমন বিশাল, সুরও তেমনি মধুর। উর্ম্মিলার মনে আছে—এই যন্ত্রটাই রাজশেখর ফুলশয্যার রাত্রে তাহাকে বাজাইয়া শুনাইয়াছিল। প্রথম কৈশোরের স্বামী-সম্ভাষণের স্বপ্নের সহিত সেটা ঠিক না মিলিলেও সে অপূর্ব্ব সুরগুঞ্জনে উর্ম্মিলা সেদিন মুগ্ধই হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যে দেবতার হাত দিয়া এই সুরের ধারা নামিয়া আসিতেছে, তাহার সমস্ত মন-প্রাণ উৎসর্গ না করিলে তাঁহার পুজা হইবে না. তাঁহার রথচক্রতলে যদি কৈশোর-যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন পিষিয়া যায় ত যাক্!

তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া এই অভিনয়ই চলিয়াছিল। রাতের পর রাত, যখন নব-বিবাহিত দম্পতীর শুধু প্রণয়গুঞ্জনে কাটিবার কথা, তখন চলিত তাহাদের বাসর-শয্যায় সেতারের গুঞ্জন। আত্মীয়েরা হাসাহাসি করিয়াছেন,

বাহিরের লোকও উপহাস করিয়াছে, কিন্তু তবু তাহার জীবনের বসন্তরজনী সেদিন যে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছিল, এমন কথা ত উর্ম্মিলা বলিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কোন কোন দিন বা সারারাত্রি, শুদ্ধ মাত্র একটি শ্রোত্রীকে উপলক্ষ্য করিয়াই যে সুরের ইন্দ্রজাল রাজশেখর রচনা করিত—তাহাকে প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূজা বলিয়াই ত উর্ম্মিলা গ্রহণ করিয়াছে! হয়ত সারা দিনের ভাবিয়া-রাখা অনেক কথা বলা হয় নাই, হয়ত বা মনের বহু কামনা অপূর্ণ থাকিতেই রাত পোহাইয়া গিয়াছে, তবু কিন্তু সেদিন উর্ম্মিলা সুখীই হইয়াছিল!······

উর্ম্মিলা সেতারটা হাতে করিয়া সেই মলিন ছিন্ন শতরঞ্চিটার উপর বসিয়া পড়িল। তাহার এই অভিশপ্ত জীবনে যে কটা দিন সে সুখের মুখ দেখিয়াছিল তাহার স্মৃতির অনেকখানিই জড়াইয়া আছে এই সেতারটি বা এই সেতারগুলির সঙ্গে। মনে আছে, একদিন ছাদে শুইয়া সেতার শুনিতে শুনিতে সে রাজশেখরকে বলিয়াছিল, "এই সেতারটার ওপর আমার বড্ড রাগ কিন্তু!"

হাসিয়া রাজশেখর বলিয়াছিল, "কেন মিলি?"

মিলি জবাব দিয়াছিল, "আমার কেবলই মনে হয়—তুমি আমার চেয়ে ঐ সেতারটাকে বেশী ভালবাস। ওটা সতীনেরও বেশী শত্রু।"

রাজশেখর বলিয়াছিল, "উঁহু, মূলেই ভুল রাণীজী, আমি ওর চেয়ে তোমাকেই বেশী ভালবাসি। তার প্রমাণ চাও? তুমি এক একদিন রাত্রে বাজনা শুনতে শুনতে যখন ঘুমিয়ে পড়ো, তখন সেতারটাকে এখানে রেখে আগে তোমাকে কোলে ক'রে ঘরে শুইয়ে রেখে আসি, তারপর সেতারটা নিয়ে যাই।"

উর্ম্মিলা বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল, "বলো কি?···এ আমার বিশ্বাস হয় না। সেতার ফেলে তুমি আমাকে আগে নিয়ে যাও!······যে সেতার তোমার প্রাণ!"

রাজশেখর শুধু জবাব দিয়াছিল, "তুমি ঠিকই বলেছ মিলি, সেতার আমার প্রাণ বটে কিন্তু তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি যে!"

সামান্য কথা, তাহার পরই রাজশেখর আবার সেতারটা তুলিয়া বাজাইতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু সেই দুটি কথাতেই আনন্দে উর্ম্মিলার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে জানিত যে রাজশেখর সেদিন মিথ্যা বলে নাই।

কথাগুলা মনে পড়িতেই উর্ম্মিলা শিহরিয়া উঠিল। সেতার রাজশেখরের প্রাণ, সেগুলিকে নষ্ট করা মানে স্বামীহত্যা! না সে সম্ভব নয়।

শুধু কি তাই! এই সেতারগুলি ত তাহাকে শুধু আনন্দই দেয় নাই। শোকে, দুঃখে, কঠিনতম বেদনাতেও সান্ত্বনা দিয়াছে। কত অভিমান, কত আঘাতের মালিন্য স্বামী তাহার অজস্র সুরের ধারায় ধোয়াইয়া দিয়াছেন। খোকা যেদিন মারা যায়, সেদিন সে শোকে পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজশেখরকেও কম কুবাক্য বলে নাই; রাজশেখর নীরবে চোখের জল মুছিয়া সেতারটি হাতে করিয়া উর্ম্মিলাকে বলিয়াছিল, "তোমার পায়ে পড়ি মিলি, তুমি পাঁচ মিনিট শোন, অনেক হাল্কা হয়ে যাবে বুকটা।"

সেদিন সে নিজের বুকের সব বেদনাই বোধ করি সেতারে ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহার স্বামীর হাতেও অমন বাজনা উর্ম্মিলা আর কোনদিন শোনে নাই। প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া একটি গৎ বাজাইবার পর রাজশেখর উর্ম্মিলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মৃদুকণ্ঠে শুধু ডাকিয়াছিল, "মিলি, আমাকে ক্ষমা করতে পারলে?"

সেদিন অজস্র অশ্রুজলের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বুকে বুক রাখিয়া যে অসীম আনন্দ পাইয়াছিল, যে সান্ত্বনা মিলিয়াছিল তাহাদের—তার মূল্য কি কম! সে-ও ত সম্ভব হইয়াছিল এই সেতারটির জন্যই।

না, উর্ম্মিলা এতদিন পরে বুঝিতে পারিল যে, কবে সকলের অগোচরে এই সেতারগুলি তাহারও প্রাণের সহিত এক হইয়া গিয়াছে, এগুলিকে নষ্ট করা আর তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

অকস্মাৎ তাহার চমক ভাঙিল, স্বামীর কণ্ঠস্বরে।

"মিলি! তুমি এ ঘরে!"

উর্ম্মিলা চমকিয়া উঠিয়া সেতারটা সযত্নে রাখিয়া দিয়া নামিয়া আসিল চৌকী হইতে। সে বিষম অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া স্বামীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিল না।

কিন্তু রাজশেখরই কাছে আসিল। উর্ম্মিলার একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া কহিল, "এই নাও টাকা মিলি, মুদিকে এই নিয়ে আপাতত ঠাণ্ডা করো, পরে আরও দেব।"

দু'খানা দশ টাকার নোট।

উর্ম্মিলা বিস্মিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। রাজশেখরের শীর্ণমুখে কে যেন কালী মাড়িয়া দিয়াছে। সে ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "এ টাকা তুমি কোথায় পেলে? কোথায় গিয়েছিলে না খেয়ে দেয়ে?"

ম্লান হাসিয়া রাজশেখর কহিল, "একটা সেতার বিক্রী করে এলাম, ত্রিশ টাকা দেবে বলেছে, সন্ধ্যার সময় বাকী দশ টাকা দিয়ে নিয়ে যাবে।"

শিহরিয়া উঠিয়া উর্ম্মিলা কহিল, "কোন্ সেতার?"

"যেটা হোক দেবো। সবগুলোই বিক্রী করব ঠিক করেছি, ওগুলো ় আর কোন কাজে লাগতে পারব না।"

র্ম্মিলা টাকাগুলা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "টাকা তুমি ফিরিয়ে ়সো। সেতার আমি বেচতে দেবো না।"

জশেখর কহিল, "ভুল করছ মিলি, বড্ড ভুল করছ! এ সর্ব্বনাশের বীজ াই ভাল। নেশার শেষ ক'রে দিই।"

া-না।" দৃঢ়কণ্ঠে উর্ম্মিলা কহিল, "সে হবে না। টাকাটা তুমি ফেরৎ এখনই।"

হার দুই চোখে জল টল-টল করিতেছিল।

জশেখর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

ভাংচি

স্টেশন হইতে গ্রাম অনেকটা দূর, কাছাকাছি কোথাও বসতির চিহ্নমাত্র নাই, শুধু মাঠ আর ধানের ক্ষেত। দূর বনান্তরালে দুটি একটি মাত্র সাদা বাড়ী ও খড়ের চালা স্টেশন হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, অথচ গ্রাম বেশ বর্দ্ধিষ্ণু; অনেকখানি দূর বলিয়াই তাহার আয়তন এখান হইতে চোখে পড়ে না।

কিন্তু স্টেশনের কাছে একেবারেই কিছু নাই বলিলে ভুল বলা হইবে। স্টেশনের গোটা দুই কোয়ার্টার আছে, একটা পাকা বাঁধানো ইঁদারা আছে আর আছে একটি মাত্র চালায় দুইটি দোকান। অপেক্ষাকৃত যেটি বড়—সেটিতে চা, ডাব, কেক-বিস্কুট হইতে শুরু করিয়া তেলে তাজা ও ঘিয়ে ভাজা খাবার, কিছু কিছু মনোহারী জিনিস, এমন কি ডিম ও আলু পটল পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। আর ছোটটিতে পান বিড়ির দোকান দেয় আশু পণ্ডিত।

আশু যে কি হিসাবে পণ্ডিত আখ্যা পাইল তাহা বোধ করি স্বয়ং অন্তর্য্যামীরও অনুমান করা শক্ত। তবে পণ্ডিত না হইলেও সময় বিশেষে পুরোহিতের কাজ সে করে এবং প্রয়োজন হইলে কুলাচার্য্যেরও। গ্রামে পুরোহিত বা কুলাচার্য্য আরও আছে সুতরাং প্রায়-নিরক্ষর আশুর পক্ষে শুধু ঐ কাজের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা-অর্জ্জন সম্ভব নয়, সেই জন্যই বাধ্য হইয়া তাহাকে বিড়ির দোকান দিতে হইয়াছে, এই তিনটি বৃত্তি জড়াইয়া কোনমতে তাহার জীবনধারণের খরচাটা ওঠে।

তাই সেদিন পাঁচটার ট্রেনের সময় শ্রীশ মুখুজ্জেকে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া তাহারই দোকানের সামনে গতি মন্থর করিতে দেখিয়া আশু উল্লসিত হইয়া উঠিল। এক লাফ দিয়া দোকান হইতে নামিয়া ভাঙ্গা টুলটা কোঁচার খুঁট দিয়া ঝাড়িয়া দিয়া কহিল, "বসুন বসুন বড়বাবু।"

শ্রীশবাবুর এক হাতে ছিল প্রকাণ্ড বাজারের পুঁটুলি আর এক হাতে ছাতা, ইলিস মাছ ও কিসের একটা ঠোঙ্গা; সুতরাং তিনি বসিলেন না

কহিলেন, "আর বলব না পণ্ডিত, তুমিই শোন—। আমার ছেলেটার কি করলে ?"

আশু মুখ কাঁচুমাঁচু করিয়া কহিল, "চেষ্টা ত করছি বাবু, ভালো মেয়ে যে পাই না। যা-তা ত আর আপনাকে গছিয়ে দিতে পারি না।"

শ্রীশবাবু কহিলেন, "না না। আমার সুন্দরের বাড়ী, পণ নষ্ট আমি করব না কিছুতেই, তাতে ছেলে চিরকাল আইবুড়ো থাকে তাও ভাল।"

শ্রীশবাবু চুপ করিলেন। আশু ঠিক কী বলা উচিত ভাবিয়া পাইল না, শুধু বোকার মত হাসিতে হাসিতে কহিল, "তাইত, তাইত! আপনাদের কি যে-সে বাড়ী!"

শ্রীশবাবু বলিলেন, "শোন এখন যা বলতে এসেছি। জোগ্রামে একটি নাকি সুন্দর মেয়ে আছে, আমাদের পাল্‌টি ঘর, শাণ্ডিল্য গোত্র—সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে। সবাই বলছে মেয়ে সাক্ষাৎ পরী। একবার দেখে আসতে পারো ?··· আমি ত আর বরের বাপ হয়ে যেচে যেতে পারি না। তুমি যেন এম্‌নি গেছ মেয়ের খবর পেয়ে, হাতে অনেক ছেলে আছে তাই—তারপর কথায় কথায় আমাদের কথা তুল্‌বে। তখন একদিন গিয়ে দেখে আস্‌ব, বুঝলে না ? তাতে মনে হবে যে তুমিই আমাকে জোর ক'রে ডেকে নিয়ে গেছ।"

তারপর অর্থপূর্ণ ভাবে একটু হাসিয়া কহিলেন, "ও পক্ষ থেকেও তাতে তোমার দু'পয়সা পাওনা হবে, বুঝলে না ?"

আশু ভাল রকমই বুঝিল এবং আরও বিনীতভাবে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

শ্রীশবাবু কহিলেন, "তাহ'লে তুমি কালই দুপুরের গাড়ীতে চলে যাও, খবর নিয়ে এসো—গোপাল চক্রবর্ত্তী মেয়ের বাপের নাম, কলকাতার বড় ডাকঘরে কাজ করে, বাড়ী খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না। কাল ছুটি আছে, চক্রবর্ত্তীকেও বাড়ীতে পাবে বোধ হয়।"

আশু কহিল, "যে আজ্ঞে, কালই যাবো।"

শ্রীশবাবু পুঁটুলিটা টুলে নামাইয়া পকেট হইতে একটি আধুলি বাহির

করিয়া তাহার হাতে দিলেন ; বলিলেন, "তোমার যাওয়া-আসার খরচা সাত আনা, আর এক আনা চায়ের খরচা—পুরোই দিলুম।"

আশু পরের দিনই জৌগ্রাম যাত্রা করিল। গোপাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীও খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইল না। কিন্তু গোলমাল বাধাইলেন চক্রবর্ত্তী নিজে। কহিলেন, "ওসব ঘটক-টটকের কাজ নয় ঠাকুর। কত ঘটকই গেল। মিছিমিছি হাঙ্গামা।"

আশু ক্ষুণ্ণ হইল। একটু যেন উষ্ণভাবেই কহিল, "ঘটক ঢের দেখেছেন বটে কিন্তু আশু পণ্ডিতকে দেখেন নি। হাতে পাত্তর না থাকলে সে মেয়ের বাপের কাছে আসে না।"

গোপাল চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "পাত্তরের অভাব নেই বাংলা দেশে তা আমি জানি। অভাব হচ্ছে আমার টাকার, পয়সা আমি একটিও দিতে পারব না, সাফ্ কথা। এর পরেও আমার কাজ করতে চাও ?"

আশু কহিল, "টাকাও খরচা করবেন না আবার মেজাজও দেখাবেন ? এ মন্দ নয়।"

তাহার পর বিনা নিমন্ত্রণেই দাওয়ার উপর জাঁকিয়া বসিয়া কহিল, "সে মরুকগে, ব্রাহ্মণ সন্তানকে এখন এক ঘটি জল খাওয়াবেন, না পুকুরে যেতে হবে ?"

গোপাল এবার লজ্জিত হইলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে দুটি দেশীয় মোণ্ডা ও এক ঘটি জল নিজেই আনিয়া দিলেন, চাকরকে বলিলেন তামাক সাজিতে।

জলপান শেষ করিয়া সহসা আশু যেন ধমক দিয়া উঠিল, "কিন্তু পয়সা খরচই বা করবেন না কেন ? বড় চাকরী ত করেন শুনলুম।"

গোপাল ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, "এ খবরটি আবার কে দিলে ?"

"যে মেয়ের খবর দিলে, সে-ই ওটাও দিয়েছে—"

গোপাল মৃদু হাসিয়া কহিল, "যেই দিক, একটু ভুল খবর দিয়েছে। বড় ডাকঘরে কাজ করি বটে, কিন্তু বড় চাকরী করিনে। যাই হোক্—সে আয়

ব্যয়ের হিসেবে দরকার নেই এখন। একেবারে বিনা পয়সায় পারো ত দেখ—"

আশু যেন বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল, মনে মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল, "তাইত, শক্তিগড়ের মুখুজ্জেদের ছেলেটা চারটে পাশও করেছে আবার সরকারী চাকরীও করে, পাত্তর হিসেবে ফাস্টো কেলাস বটে তবে একেবারে শুধু হাত ওখানে মুখে উঠ্বে না। গোপালপুরের শশী গাঙ্গুলীর ছেলে কোন্ কলেজে যেন মাস্টারী করে, তারও একটু খাঁই আছে।—হয়েছে। আমাদের গাঁয়েই ত রয়েছে। কাছের লোক কিনা, তাই একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। শিরিষ মুখুজ্জের ছেলেই ত রয়েছে। হ্যাঁ বাবু, মেয়েটি আপনার দেখতে কেমন বলুন দেখি ?"

গোপাল চক্রবর্ত্তী খোঁচা না দিয়া কথা বলিতে পারেন না। কহিলেন, "আমার খবর যেখান থেকে পেলে সেখানে কিছু শোন নি ? না, না শুনেই দুপুর রোদে এতদূরে ছুটে এসেছ ? মেয়ে আমার দেখতে ভালই—"

আগেকার খোঁচাটা গায়ে না মাখিয়া আশু যেন লাফাইয়া উঠিল, "বাস্ তা যদি হয় তাহ'লে ত আর কথাই নেই। শিরিষ মুখুজ্জের ধনুক ভাঙ্গা পণ—ঘর থেকে খরচা ক'রে তা'র ছেলের বৌ আন্‌তে হয় তাও সই, মোদ্দা কুচ্ছিৎ মেয়ে ঘরে আনবে না কিছুতেই। ওরা সুন্দরের বংশ কিনা! ছেলে, বাবু, যাকে বলে ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিক। যেমন রূপ, তেম্‌নি গুণ—"

"কি করে তোমার শিরিষ মুখুজ্জের ছেলে ?"

"কী করে ? বলেন কি বাবু, চারটে পাশ করেছে সে ছেলে, অনার না কি বলে তাও পেয়েছে, এখন শুধু বাপের অফিসে ঢুকতে যা দেরি।"

গোপাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাপ কি করেন ?"

"সরকারী চাকরী করে গো, কাষ্টম অফিসে, বেশ মোটা মাইনে। ওর বাপ ছিল সেকালের গ্রেহাম কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি, পয়সার অভাব নেই ওদের।"

গোপাল একটুখানি যেন ভাবিয়া বলিলেন, "শিরিষ কি তা'হলে প্রাণধন মুখুজ্জের ছেলে ?"

"ঠিক ধরেছেন, বাবু! দেশের অর্দ্ধেক জমিই ত ওদের। জমিদার আছেন নামে।"

গোপাল জবাব দিলেন, "শিরিষের ভাই আমার সঙ্গে পড়ত, যে মারা গেছে। এখন চিন্‌তে পারলুম। যাক—দেখ যদি লাগাতে পারো। মোদ্দা একেবারে শুধুহাতে কি ওরা ছেলে ছাড়বে? মুখে অনেকেই বলে প্রথমে, কাজের বেলা এসে আড়াই হাজার টাকার ফর্দ্দ দেয়—"

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া আশু কহিল, "ছাড়বে বাবু, ওরা সে রকম লোক নয়। তবে মেয়ে সুন্দর হওয়া চাই, তা ব'লে রাখছি।"

গোপাল কহিলেন, "মেয়ে আমার পছন্দ হবে, এ গ্যারান্টি দিতে পারি।"

আশু একবার মাথাটা চুলকাইয়া কহিল, "সে দেখুন প্রায় সব মেয়ের বাপই বলে, কিন্তু কাজের বেলায় দেখি অন্তরকম।"

খোঁচাটা বুঝিয়া গোপাল কহিলেন, "বেশ ত, সে সন্দেহে আর কাজ কি, মেয়েকে আমি এখনই ডাক্‌ছি—নিজে চোখে একবার দেখে যাও, যেমন আছে তেমনি আস্‌রে, সাজ-গোজ কিছুই তো করা নেই—দেখেই যাও একবার। তুমি একে বুড়োমানুষ তায় ঘটক—তোমার কাছে বেরোবে তাতে আর লজ্জা কি?"

তাহার পরই হাঁক দিলেন, "মাধু, ওমা মাধু রে!···ও মাধু—"

"কী বাবা?" বলিয়া মাধুরীলতা একেবারে বাহিরের দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিল। কি একটা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল, হাতে একটা ময়লা কাপড়ের টুক্‌রা ন্যাতার মতো পাকানো, আঁচলের কাপড়টা কোমরে জড়ানো, যাহাকে বলে গাছ-কোমর বাঁধা। আর কেহ নাই মনে করিয়া সে ঐ ভাবেই বাহির হইয়া আসিয়াছিল; এখন বাবার সঙ্গে অপরিচিত লোককে দেখিয়া লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি ন্যাক্‌ড়াটা ফেলিয়া দিয়া আঁচলের কাপড়টা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

আশুর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না, সে মুগ্ধ অপলক নেত্রে মেয়েটিকে দেখিতেছিল। চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স তাহার, প্রথম কৈশোরের অঞ্জন

লাগিয়াছে তাহার সারা দেহে। স্নিগ্ধ গৌর বর্ণ, ভাসাভাসা চোখ, তুলি দিয়া আঁকার মত ভ্রূ, পাত্‌লা ঠোঁটের মধ্যে মুক্তার মত দাঁত, সুগঠিত সুশ্রী দেহ। পিঠ ঢাকিয়া পড়িয়াছে প্রতিমার মত একরাশ ঢেউ খেলানো কালো চুল, তাহারই দুই-একটি সুন্দর ললাটে স্বেদবিন্দুর সহিত জড়াইয়া গিয়া সে মুখকে আরও লাবণ্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।···আশু আর চোখ ফিরাইতে পারিল না।

"কী বাবা ?"

আর একবার মাধুরী প্রশ্ন করিল। গোপাল কহিলেন, "কিছু না, তুই যা।"

মেয়েটি একরকম ছুটিয়াই পলাইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "দেখলে ত ঠাকুর ? চলবে এ মেয়ে ?"

আশুর এতক্ষণে চৈতন্য ফিরিয়াছিল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এ মেয়ে চলবে না, বলেন কি ?···সাক্ষাৎ উমা যেন মহাদেবের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের সুহাসের সঙ্গে খাসা মানাবে।"

গোপাল কহিলেন, "দেখ, যদি লাগাতে পারো—আমার বরাত আর তোমার হাতযশ।"

আশু ছাতাটি বগলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি এখনই যাচ্ছি। যাতে রবিবার দেখতে আসে তারই বন্দোবস্ত ক'রে ফেলি—মোদ্দা বাবু, আমার বিদেয়টা মোটা পাবো ত ?"

গোপাল হাসিয়া অভয় দিলেন।

ট্রেন হইতে নামিয়া আশু সোজা শ্রীশবাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল। পাঁচশ' বিড়ি আর কয়েক খিলি পান সুধীরের দোকানে দেওয়া আছে, সেটা ছুটির দিন, স্টেশন অঞ্চলে খরিদ্দারের ভীড় কম। সুতরাং দোকান খোলার বিশেষ তাড়া ছিল না।

শ্রীশবাবু তাহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "কেমন দেখলে পণ্ডিত ? চলবে ?"

আশু বসিয়া পড়িয়া ছাতাটাতেই মুখটা মুছিয়া কহিল, "এখন আমার বক্‌শিশটার ব্যবস্থা করুন দেখি আগে, তারপর অন্য কথা। আমি কিন্তু একশ' টাকার কম ছাড়ছিনে!"

শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিলেন, "বখ্‌শিশ ত আমারই পাওয়া দরকার হে, আমিই ত সন্ধান আনলুম।...যাকৃগে, তার জন্যে আটকাবে না, এখন মেয়ে কেমন দেখলে তাই বলো।"

আশু জবাব দিল, "সে মেয়ে যে কেমন দেখতে তা আপনাকে বোঝাতে পারব না বড়বাবু, আমার ত মনে হ'ল সাক্ষাৎ দুগ্‌গো ঠাকুরুণ চালচিত্তির থেকে নেমে এলেন, ঠিক তেম্‌নি রূপ! আমাদের সুহাসের সঙ্গে যা মানাবে, যেন হর-পার্ব্বতী মিলন।"

শ্রীশ তখনই উঠিয়া অন্তঃপুরে সংবাদটা দিয়া আসিলেন, পণ্ডিতের জন্য চা ও সন্দেশের ব্যবস্থাও হইল; তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তারপর কথাবার্ত্তা কিছু হ'লো নাকি?"

আশু সগর্ব্বে কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আশু পণ্ডিত যখন গেছে তখন পাকা ব্যবস্থা না ক'রে কি আসে?...রবিবার আপনারা দেখতে যাবেন বলে এসেছি। আপনাকে চেনে, আপনার ভায়ের সঙ্গে নাকি পড়েছিল। মোদ্দা এক পয়সাও দেবে না বড়বাবু, সেই কথা আগেই ব'লে দিয়েছে—"

"এক পয়সাও দেবেনা? বলো কি?"

"সে কথা বারবার ব'লে দিয়েছে, মানুষটাও মনে হ'ল একরোখা গোছের।"

শ্রীশ একটু যেন চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "ছেলের বিয়ের সব খরচা ঘর থেকে করতে হবে,...তাইত!...কিন্তু কিছুই কি আর দেবে না, নিজের মেয়ে, অন্তত গায়েও দু'খানা একখানা সাজিয়ে দেবে ত! যাকৃগে, মেয়ে যখন অত সুন্দরী বলছ—"

আশু জোর করিয়া কহিল, "সে মেয়ে ঘর থেকে পয়সা খরচ ক'রে আনবার মতই বাবু, ও নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না।"

"আচ্ছা তাই হবে। রবিবারেই দেখ্‌তে যাবো তাহ'লে।"

আশু সোজাসুজি দোকানে না গিয়া নিজের বাড়ীতে আসিল আগে। সারা দুপুরটা রোদে রোদে ঘোরা হইয়াছে, একটুখানি বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু বাড়ীর তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই কেমন যেন মনটা বিষাক্ত হইয়া গেল।···বাড়ী নামেই, পৈত্রিক ভিটাটা আছে এই পর্য্যন্ত। সারা উঠানটা জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ইঁট পাতা আছে তাই কোনমতে ঘরে পৌঁছানো যায়। ঘরের অবস্থাও তথৈবচ, ধূলায় ও জঞ্জালে যেন এক-হাঁটু।

অথচ এক কালে আশু খুব সৌখীনই ছিল। কোথাও এতটুকু ময়লা সে সহিতে পারিত না। সংসার তাহার চিরকালই ছোট—মা, স্ত্রী আর একটি ছেলে, সুতরাং কাজ ছিল কম। দুইজনে পরিশ্রমও করিতে পারিত খুব, চারিদিক তক্-তক্ ঝক্-ঝক্ করিত তাহাদের খবরদারিতে। মা চার-পাঁচদিন অন্তরই কাপড়-জামা-বিছানা সোডা সাজিমাটি প্রভৃতি দিয়া ফুটাইয়া লইতেন, ফলে বাড়ীতে কেহ আসিলে কোনদিনই দরিদ্রের সংসার বলিয়া টের পাইত না।

শুধু কি তাই? এই উঠান আজ আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে অথচ তাহারা থাকিতে কুমড়া লাউ ঝিঙ্গা প্রভৃতি কত ফসলই হইত এখানে, শাক-সব্জীর জন্য কোন দিনই হাটে বাজারে যাইতে হয় নাই। এমন কি, বাগানের কলা গাছ, পেঁপে গাছ প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু আয়ও হইত। আর এখন? বাহিরের জঙ্গলে বাঘ লুকাইয়া থাকাও বিচিত্র নয়।

আশু ছাতাটা ঘরের এক কোণে রাখিয়া কোনমতে চাদর জামা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। বিছানা যেমন ময়লা, তেমনি তাহাতে ছারপোকার উপদ্রব, তবু তাহার উপরই শুইতে হয়। নেহাৎ অসহ্য হইয়া উঠিলে, কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্তর এক একদিন ঘর সাফ করিতে বসে কিন্তু অনভ্যস্ত হাতে অর্দ্ধেক ময়লা যায়, অর্দ্ধেক যায় না। বালিসের ওয়াড় ধোপাবাড়ী দিলে খালি বালিসই মাথায় দিতে হয়, কাচিয়া আসিলেও পরাইতে পরাইতে দশদিন কাটিয়া যায়—এমন অবস্থা।

অথচ—যাক্ সে কথা! আশুর এখন ভাবিতেও আর ভাল লাগেনা, কষ্ট হয়।

কেমন করিয়া যে কী হইল, আশ্চর্য্য! সাজানো বাড়ী, সুখের সংসার, নিমেষে যেন কাহার অভিশাপে পুড়িয়া গেল। মা গেলেন কলেরায়; স্ত্রী সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল কিন্তু সাত মাস যাইতে না যাইতে তাহাকেও দুর্দ্দান্ত নিউমোনিয়ায় ধরিল। বাকি রহিল ছেলেটা, তাহাকে তাহার দিদিমা আসিয়া লইয়া গেলেন, আশু নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু ভগবানের রোষদৃষ্টি যাহার উপর পড়িয়াছে, সামান্য সুকুমার শিশুকে কি সে বাঁচাইতে পারে? মাস তিনেক যাইতে না যাইতে চিঠি আসিল, টাইফয়েড হইয়াছে তাহার। আশু স্ত্রীর শেষ চিহ্ন বালা-জোড়া বিক্রয় করিয়া ছুটিল শ্বশুরবাড়ীতে, সেখানে যতটা চিকিৎসা সম্ভব সমস্তই করা হইল কিন্তু তবু সে গুঁড়াটুকুকে বাঁচানো গেল না। আত্মীয় বলিতে আর কেহ রহিল না—এই বিশাল পৃথিবীতে জীবনের বোঝা বহিতে রহিল শুধু সে একা।···

আশু আর কিছুতেই শুইয়া থাকিতে পারিল না। ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের কোণে গিয়া তামাকের সরঞ্জাম বাহির করিয়া সাজিতে বসিল। বিড়ির দোকান আছে বটে তাহার, কিন্তু বিড়ি সে খাইতে পারে না—

তামাক সাজিতে সাজিতে মনে পড়িল এ কাজও, যতদিন স্ত্রী ছিল, তাহাকে করিতে হয় নাই। হাতে যত কাজই থাক্ না কেন, একটা হাঁক মারিলেই সে আসিয়া সাজিয়া দিয়া যাইত, কোনদিন তাহার জন্য বিরক্ত হয় নাই। আশু হয়ত জানে না, ভাত খাইতে বসিয়াছে সে, তামাকের কথা কানে যাইতে ভাত ফেলিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া তামাক সাজিয়া দিয়াছে।···

না, নিজের সংসার যাহার নাই—সেবা করিবার, যত্ন করিবার জন্য কেহ যার বাঁচিয়া নাই—জীবন ধারণ তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা!

তবু ত আশু বাঁচিয়া আছে। খোকাটাও যখন মারা গেল তখন সকলেই ভাবিয়াছিল যে আশু পাগল হইয়া যাইবে। অথচ সে শুধু যে বাঁচিয়া আছে

তাহাই নয়, নিয়ম-মত সে দোকানও খুলিতেছে, ব্যবসাও করিতেছে, পূর্ব্ব অভ্যাস মত মনসা পূজা, লক্ষ্মী পূজা প্রভৃতিও ঠিক চলিতেছে; এমন কি ঘটকালী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাও বাদ যাইতেছে না। কাহারও জন্ম কাহারও আটকায় না, জীবনটা কিছু বিড়ম্বিত হয় এই মাত্র।···

তামাকও আশুর ভাল লাগিল না। কয়েক টান দিয়াই হুঁকা রাখিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ঘরে তালা দিয়া অভ্যাস-মত দোকানের পথ ধরিল। সন্ধ্যার আর দেরী নাই, সুধীর একটু পরেই দোকান বন্ধ করিবে, তাহার নিকট হইতে পয়সা-কড়ি বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু খানিকটা দূর গিয়াই শেঠেদের ঝিলের ধারে তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিল। ভাল লাগিতেছে না, কিছুই ভাল লাগিতেছে না তাহার। আজ যেন অকস্মাৎ সমস্ত কিছুই বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে।

শেঠেদের ঝিলের বাঁধানো চত্বর তখন জনবিরল, বাগানের নিবিড় ছায়ার ফাঁক দিয়া মেঘ-মলিন জ্যোৎস্নার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহারই আলোয় ঝিলের শান্ত কালো জল বড় সুন্দর দেখাইতেছে আজ।

আশু ছাতা দিয়া চত্বরের একাংশ ঝাড়িয়া ইঁটের বেদীতে ঠেস দিয়া বসিল। এমন ভাবে আর কতদিন চলিবে তাহার? এই ভবঘুরের মত জীবন যাত্রা?···সুধীরদের বাড়ী সে খায় তাহার জন্য মাসে পাঁচটি টাকা দিতে হয়; তাছাড়া চা, জলখাবার প্রভৃতিতেও কম যায় না, অথচ এই অসুবিধা। রাস্তার ভিখারীরাও বোধহয় ইহার চেয়ে আরামে থাকে।···

আচ্ছা—। যে কথাটি কয়দিন ধরিয়াই মনের অবচেতন গহ্বরে উঁকি মারিতেছিল আজ তাহাই মূর্ত্তি ধরিল, আর একবার সংসার পাতিলে কি হয়? বয়স গিয়াছে?···কতই আর বয়স তার, চুয়াল্লিশের ত বেশী নয়। এই বয়সে কী এমন বুড়া হইয়াছে সে, যে আর সংসার পাতা চলে না?···গোপাল চক্রবর্ত্তীর যেন ভীমরতি ধরিয়াছে তাই সে অনায়াসে আশুকে বুড়া বলিয়া দিল; কিন্তু আশু ত তাহার বয়স জানে! মাথার চুল ত কত লোকের অকালে

পাকে! পয়সাও সে কম রোজগার করে না, কুড়ি, পঁচিশ এমন কি কোন কোন মাসে ত্রিশ পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে একটা ছোট সংসার চলে না?—খুব চলে।

সে কল্পনানেত্রে তাহার নূতন সংসারের ছবি দেখিতে লাগিল। নূতন বধূ মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছে, ফায় ফরমাস করিলে নতমুখে আদেশ পালন করিতেছে আর রসিকতা করিলে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে শুধু। আবার ঘর-দ্বার হইয়া উঠিয়াছে শ্রীমণ্ডিত উজ্জ্বল, বিছানা পরিষ্কার, বাগানে আগের মতই ফুল-ফল-ফসলের বাহার, সময়মত পান-জল ঠিক আসিতেছে—পোড়ো বাড়ীর কদর্য্যতার মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা সহসা আবার আনন্দমুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহার!···

না, বিবাহ সে করিবেই আবার, কাহারও কোন কথা শুনিবে না।···

আচ্ছা, নূতন বউ কেমন দেখিতে হইবে কে জানে!···বয়স কমই হইবে, বেশী বয়সের মেয়েকে পোষ মানানো যায় না।···আশু তাহার নূতন বধূকে যত রকম করিয়াই কল্পনা করে, কোথা দিয়া কী করিয়া যেন মাধুরীলতার ছবিটাই চোখের সামনে আসিয়া পড়ে।···অমন মেয়ে পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই তাহার, এ সত্য কথা; আশুর চেয়ে সেকথা বেশী করিয়া আর কেহ জানে না, তবু সেই লজ্জাবনতমুখী কিশোরীর ছবিটিই কল্পনার সহিত বার বার মিশিয়া যায়।

আশু নিজেকে মনে মনে ধমক দিয়া উঠিল, স্পর্দ্ধা ত খুব দেখি! যে মেয়ে রাজার মুকুটে মানায় তাহাকে তুমি লোভ কর?

তা নয়। তবে অল্পবয়সী মেয়েই সে আনিবে। দক্ষিণপাড়ার কেনারাম ভট্টচার্য্যের মেয়েটি বিবাহের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে নাকি। দেখিতে তত ভাল নয়, রং-ও কালো, তবু অল্প বয়স তাহার, আর বেশ কাজ-কর্ম্মের। কেনারামের যা অবস্থা, আশু বলিলে হাতে স্বর্গ পাইবে সে। এখন ত মেয়েটা দুই বেলা ভাতই পায় না, আশুর ঘরে সে হইবে একা গৃহিনী—কেনারামের পক্ষে এমন পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা।

যাক্—কেনারাম নাকি সুধীরের কী রকম জ্ঞাতি হয়।

দশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করিয়া সে সুধীরের দোকানে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন দোকানে কেহ নাই। ছয়টার গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, সাতটার গাড়ীর তখনও সময় হয় নাই, এমন সময় কেহ থাকা সম্ভব নয়।

সুধীর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "ব্যাপার কি আশুদা, তুমি যে দিন কাবার ক'রে এলে!"

আশু ক্লান্তভাবে তাহার বেঞ্চিটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, "এসেছি অনেকক্ষণ। শরীরটা ভাল লাগছিল না ব'লে বাড়ীতে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। আর পারি না ভাই সুধীর!"

সুধীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, "অসুখ-বিসুখ কিছু—"

"না, না, অসুখ নয়—এমনি। একা একা এই ভাবে দিন কাটানো আর কি চলে? এখন বয়স হচ্ছে, একটু যত্ন-আত্তি দরকার ত! এখন কোথায় পাঁচজনের সেবা নেব, না এখনই পড়লুম একা।"

কথার স্রোতটা কোন্ দিকে যাইতেছে বুঝিতে না পারিয়া সুধীর চুপ করিয়া রহিল। আশুও ভাবিতেছিল সুধীরই এইবার কথাটা পাড়িবে; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠেই কহিল, "না সুধীর, আমি ভেবে দেখলুম, যে যাই বলুক, আমি আবার সংসার করব।"

সুধীর অবাক হইয়া তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "হঠাৎ যে এ মতি হ'ল?"

আশু তখনও বেশ ঝাঁঝের সহিতই বলিল, "হঠাৎ আবার কি?…কী এমন বয়স হয়েছে আমার যে এখন থেকেই আমি বাউণ্ডুলে হয়ে থাক্‌বো? চুয়াল্লিশ বছর বয়স, এখন কতকাল বাঁচব তার ঠিক কি! সময়ে ভাত জল নেই, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দেবার লোক নেই, এমন ক'রে মানুষ থাকতে পারে? তারপর, আজ যেন শরীর ভাল আছে, অসুখ হ'লে দেখবে কে?"

সুধীর চোখ তুলিয়া একটু বিস্মিত ভাবেই কহিল, "তোমার মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স ?"

"না, আশীবছর!" আশু তীব্রকণ্ঠে কহিল, "তোমার চোখে কি হয়েছে, চালসে ধরেছে এই বয়সেই। আমাকে কি একেবারে থুথুরে বুড়ো দেখায়!"

সুধীর কহিল, "রাগ করছ কেন আশুদা, এমনি জিগ্যেস্ করছি। চুলগুলো সব পেকে গেছে কি না—"

আশু কহিল, "কেন তোর মাসতুতো ভাই সন্তুর চুল পাকে নি ? কত বয়স তার, তুই-ই ত বলিস্ এখনও কুড়ি হয় নি!"

"তা বটে! তবে কি জানো এ বয়সে সংসার করার বিপদ আছে। সামলাতে পারবে সব দিক ? তা ছাড়া ভাল মেয়েও পাবে কি না সন্দেহ। তার চেয়ে একটা কাউকে এনে ঘরটরগুলো—"

আশু মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না, অন্য লোকের কাজ নয়। একটু দেখাশুনা করার লোক চাই, যত্নআত্তি—অন্য লোকে কি করবে ?"

সুধীর খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "পাঁচজনে কিন্তু ঠাট্টা করবে আশুদা। তাছাড়া বয়স ত তোমার নেহাৎ কমও নয়—এ বয়সে একটা কচি মেয়ে বিয়ে করে পোষ মানাতে পারবে? আর যদি ভালমন্দ কিছু হয়—সে মেয়েটা ত পথে বসবে। জমি-জায়গা বলতে ত তোমার ঐ ভিটেটুকু।"

আশু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, একটা কটূক্তি করিয়া বলিল, "সব তাতে ফুট্ কাটিস্ কেন বল্ ত ? পাঁচজনের আর কী, ঠাট্টা ক'রেই খালাস। খেতে দেবে আমাকে তারা—অসময়ে দেখ্‌বে ?"

সুধীরের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সেও একটু চড়া মেজাজে জবাব দিল, "বেশ ত, বিয়ে কর, আমার তাতে কি ? কর না—তোমার ছাগল তুমি ন্যাজের দিকে কাটবে, আমার কি! তোমার ভালোর জন্যেই বলা। আমি কি এর আগে চেষ্টা করি নি ভাবছ ? কেনারাম কাকা খেতে পায় না, বলতে

গেলে ভিক্ষে ক'রে খায়, আর ঐ ত মেয়ের ছিরি—তবু তোমার কথা বল্‌তে সে জবাব দিয়েছিল 'না বাবাজী, সে আমি দেবো না। ঐ ত ঘাটের মড়া, ক'দিনই বা বাঁচবে, তারপর আমার মেয়েকে আবার ত সেই ভিক্ষে করতে হবে? দাঁড়াবে কোথায়, ওর আছে কি?' কেনারাম কাকাই যদি ঐ কথা বলে, ভাল মেয়ে তুমি পাবে কোথায়?"

আশু যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, "একথা কবে হ'লো তোদের?"

"সে অনেকদিন, তখনও খোকা বেঁচে আছে—"

"হুঁ।"

আশু ধীরে ধীরে আবার বাড়ীর পথ ধরিল।

সুধীর কহিল, "ও কি চললে কোথায়? হিসেব বুঝে নেবে না?"

"আজ থাক্ সুধীর, শরীরটা ভাল নেই। কাল সকালে হবে।"

তাহার পর সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তোর মা যেন আজ আর বসে না থাকে, আজ আর কিছু খাবোও না।"

সুধীর কাছে গিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "রাগ করলে না কি আশুদা?"

আশু হাতটা ছাড়াইয়া বলিল, "পাগল! শরীরটা খারাপ।...তবে এ-ও জানিস্ সুধীর, আশু পণ্ডিত যদি মনে করে, এখনও দু'পায়ে মেয়ে জড়ো করতে পারে। তোর ঐ অকালকুষ্মাণ্ড কাকাকেও বলিস্!......এই অঘ্রাণের মধ্যে যদি আমি আবার সংসার পাততে না পারি ত আশু পণ্ডিত আমার নাম নয়।"

সে আর কথা না কহিয়া হন্ হন্ করিয়া গ্রামের পথ ধরিল।

আবার সেই বাড়ী। বদ্ধ ঘরের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, মলিন শয্যা, ছারপোকার কামড়। আরশোলাগুলা আসবাবপত্রের মধ্যে খড়খড় করিয়া বেড়াইতেছে, ইঁদুরের উপদ্রবও কম নয়। বাড়ী ঢুকিবার সময় উঠানের মধ্য হইতে কী একটা সর্-সর্ করিয়া চলিয়া গেল, তাহার অবয়বটা দেখা না গেলেও জীবটা কি তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। এককথায় পোড়ো বাড়ী বলিতে যাহা বুঝায়!

আশুর চোখে জল আসিয়া পড়িল; এমন করিয়া বাঁচিয়া লাভ কি?

অথচ মরিব বলিলেই ত মরা যায় না! কত বছর পরমায়ু তাহার কে জানে, যদি সত্তর বছরই বাঁচে, কিংবা আরও বেশী? আরও ত্রিশ বছর এইভাবে কাটাইতে হইবে? সে কি সম্ভব!

আশু উঠিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলোটা জ্বালিল। হ্যারিকেনের চিম্‌নিও মার্জ্জনার অভাবে ধূমমলিন, তবু তাহারই আলোতে ছোট আয়নাটা ধরিয়া প্রাণপণে আশু নিজের মুখ দেখিতে লাগিল। কী এমন বুড়া হইয়াছে সে? চুলগুলা পাকিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সে রোগে। দাঁত একটা ছাড়া আর সবই এখনও আছে, চামড়াও বুড়াদের মত কুঞ্চিত হইয়া পড়ে নাই। বিপিন হালদার হরি ভট্‌চায—ইহারা যে সব তৃতীয় পক্ষ বিবাহ করিল শ্মশান ঘাটে একটা পা দিয়া—কই, তাহাতে ত কেহ কিছু বলিল না। যত দোষ তাহার বিবাহে! হ্যাঁ, তাহাদের অনেক জমিজমা আছে এটা ঠিক কিন্তু পয়সাটাই কি সব? তা ছাড়া সে ত উপার্জ্জন করিতেছে এখনও, স্ত্রীর জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারিবে না? যত সব—হুঁ! বিবাহ সে করিবেই, দেখিবে কে আটকায়!

কিন্তু আবারও শয্যায় শুইয়া অন্ধকারে ভাবিতে ভাবিতে তাহার উত্তাপ ক্রমশ কমিয়া আসিল। জানাশুনার মধ্যে যত মেয়ে আছে, তাহাকে কেহ দিবে বলিয়া ত মনে হয় না। ছিল এক কেনারামের মেয়েটা, তাহারও ত ঐ চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি। তাহা ছাড়া তাহার আত্মীয়ের মত সুধীরেরই যদি ঐ মনোভাব হয়, তাহা হইলে সহানুভূতি আর কোথায় পাইবে সে? সবাই ঠাট্টা করিবে, হয়ত বা ভাংচি, এমন কি বাধাও দিবে—

নাঃ! আশু যতই ভাবিয়া দেখিল ততই বুঝিল যে আর সংসার পাতিবার আশা তাহার সুদূরপরাহত। মা থাকিলেও কথা ছিল কিংবা তেমন কোন আত্মীয়-আত্মীয়া! এই ভাবেই তাহাকে চিরজীবন কাটাইতে হইবে—আর কোনও উপায় কোথাও খোলা নাই। অবশ্য এভাবেও থাকা চলিবে না। সে এ ভিটা বেচিয়া দিবে, বরং সেই টাকা সুধীরকে দিয়া সুধীরেরই বাহিরের

ঘরটায় বাসা বাঁধিবে, কিম্বা ঐ টাকাটা সম্বল করিয়া কোন তীর্থস্থানে পাড়ি দিবে। হোটেল ত কেহ ঘুচায় নাই, বিড়ির ব্যবসাও সর্ব্বত্র চলে। যাহার ঘর নাই, সংসার নাই—দেশভুঁইয়ে তাহার কিসের টান ?

একথা সেকথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ ভোর হইয়া আসিল। মনে পড়িল মাধুরীর কথা। সুহাস আর মাধুরী। সুহাসের অল্প বয়স, মাধুরীরও তাই। দু'জনের চমৎকার মিল হইবে। দুজনেরই রূপের সীমা নাই, অবস্থাও ভাল। ভাবনা-চিন্তা দুঃখ কিছুই নাই—শুধু দিনরাত দুটিতে প্রণয়-লীলাস্রোতে ভাসিয়া চলিবে।

সে কল্পনা নেত্রে মাধুরীদের সংসার যাত্রা দেখিতে লাগিল। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত, কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে ফষ্টি-নষ্টি চলে দুজনের। আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর ছোটখাট সেবা, সুহাসের জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে। আহা, এ মেয়ের হাতের সেবা যে পাইল, তাহার আর ইহজীবনে কী কাম্য থাকিতে পারে? বাড়ীতে দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও, সুহাসের নিজস্ব কাজগুলি মাধুরী নিশ্চয় নিজের হাতে করিবে। তাহার জন্য সুহাস অনুযোগ করিলেও শুনিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে সে বহু দূরে চলিয়া গেল। প্রণয়-নাট্যের সম্ভব-অসম্ভব অনেক দৃশ্যই সে দেখিতে লাগিল মনে মনে।……একদিন সুহাসের কলিকাতা হইতে কী কারণে ফিরিতে দেরি হইয়াছে, বাড়ীর লোকে তত ভাবিতেছে না, কিন্তু মাধুরী, মাধবীলতার মতই পুষ্পিতা সঞ্চরিণী সেই সুন্দরী মেয়েটি নিজের ঘরের জানালায় বাহিরের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা! তারপর রাত্রে ফিরিয়া সুহাস যখন তাহার উদ্বেগ দেখিয়া পরিহাস করিবে, তখন অভিমানে আসিবে তাহার চোখে জল, সুহাস আবার কত আদর করিয়া সেই মুখেই সুখের হাসি ফুটাইয়া তুলিবে। আবার চলিবে সারারাত ধরিয়া তাহাদের গল্প, প্রণয়-গুঞ্জন!…

কিসের একটা অব্যক্ত বেদনায় আশু যেন অস্থির হইয়া উঠিল। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিতেই দেখিল পূর্ব্বাকাশে

রক্তিমাভা দেখা দিয়াছে, ভোরের আর বেশী দেরি নাই। ভাবিতে ভাবিতে সারা রাতই কখন কাটিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারে নাই।

আর ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

ভাল করিয়া সকাল হইবার আগেই সে শ্রীশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তখনও আর কেহ ওঠে নাই, শ্রীশবাবু একা বাহিরের ঘরে বসিয়া গতদিনের কাগজখানায় চোখ বুলাইতেছিলেন। আশুকে দেখিয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিত যে! এত সকালে, কি মনে ক'রে?"

আশু কাছে বসিয়া একেবারে হাত দুইটি জোড় করিয়া কহিল, "বাবু, কাল লোভে প'ড়ে বড্ড একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছি, এবারের মত মাপ করতে হবে।"

আরও বিস্মিত হইয়া শ্রীশ কহিলেন, "ব্যাপার কি হে? খুলে বলো তবে ত বুঝি—"

"আজ্ঞে, ঐ গোপাল চক্রবর্ত্তীর মেয়ে—"

শ্রীশ কহিলেন, "হ্যাঁ গোপাল চক্রবর্ত্তীর মেয়ে কি? দেখতে ভালো নয়?"

জিভ্ কাটিয়া আশু কহিল, "আজ্ঞে না, দেখতে খুবই ভালো।"

"তবে?"

আশু ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "আমি ওদের সব খবরই নিয়েছিলুম কাল! মেয়ের মাতামহরা পাগলের বংশ—ওর দিদিমা ছিলেন পাগল, এক মামাও না কি পাগল, সে এখনও বেঁচে আছে—"

শিহরিয়া উঠিয়া শ্রীশবাবু কহিলেন, "ওরে বাপ্‌রে! পাগলের বংশ থেকে মেয়ে আমি কিছুতেই নেব না। সাক্ষাৎ অপ্সরী হ'লে না। আমার জ্যাঠাইমাকে পাগলের বাড়ী থেকে আনা হয়েছিল, তার জন্যে সেই ঠাকুর্দ্দা থেকে শুরু ক'রে আমরা পর্য্যন্ত কী জ্বালাতেই জ্বলেছি। ও কাজ আর নয়।"

আশু চুপ করিয়া রহিল। শ্রীশবাবু প্রশ্ন করিলেন, "এ কথা কাল বলো নি কেন?"

আশু কাতরকণ্ঠে জবাব দিল, "আজ্ঞে টাকার লোভে। গোপাল চক্রবর্ত্তী আমাকে একশ' টাকা কবুল করেছিল।...কী বলব বাবু, কাল আপনাকে কথাটা গোপন ক'রে পর্য্যন্ত আমার সে যে কি অস্বস্তি তা আর কাউকে জানাবার নয়। সারারাত ঘুম হলো না, ভাবলুম বড়বাবু আমাকে এত বিশ্বাস করেন তাঁকে ঠকালে আমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই। তাই ভোর না হ'তে ছুটে এসেছি—এবারটি মাপ করুন বাবু!"

আশুর শুষ্ক মুখ, আরক্ত চক্ষু দেখিয়া শ্রীশবাবুর কথাটা বিশ্বাস হইল। কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "টাকার লোভ মস্ত বড় লোভ আশু, সাম্‌লানো কি সহজ কথা! মুনিরও পদস্খলন হয়।...তুমি যে শেষ অবধি সে লোভ জয় করেছ, এইতেই বাহাদুরি দিচ্ছি।...যাক্—ও কথা আর ভেবো না। তুমি অন্য মেয়ে দেখো।"

ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া শ্রীশবাবু জোর করিয়া আশুর হাতে গুঁজিয়া দিলেন। কহিলেন, "একশ' টাকা লোকসান হলো তোমার, তার জায়গায় অবিশ্যি এ কিছু নয়— তবে ছেলের বিয়ে হ'লে আরও কিছু পাবে, তা তুমিই সম্বন্ধ করো, আর অন্য লোকই করুক।"

আশু তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দোকানের পথ ধরিল। ক্লান্ত শরীর, অবসন্ন মন। তবু যাইতেই হইবে, সাতটার গাড়ীর সময় হইয়াছে। চলিতে চলিতে মুঠার মধ্যে পাঁচটাকার নূতন নোটখানা মচ্ মচ্ করিতে লাগিল।

ব্যবসায়

মা আর ছেলে। একই বাড়ীতে থাকে, এক সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া চলে উহাদের, সেদিক দিয়া কোথাও কোন অসামঞ্জস্য নাই। কিন্তু বাজারে গেলে আর চিনিবার উপায় থাকে না।

ছেলে মাত্‌লা হইতে মাছ কিনিয়া আনিয়া বাজারে স্থানীয় মেছুনীদের কাছে পাইকারী বিক্রয় করে, মা ঐ বাজারে বসিয়াই মাছ বেচে। অন্যান্য মেছুনীদের মত সেও ভোম্বলের নিকট হইতেই পাইকারী মাছ কেনে, দর-কষাকষি করে, ওজন লইয়া 'কেজিয়া' করে এবং ফাঁক পাইলেই চুরি করে। তাহার পর আবার ফাউ পাইবার জন্য ধর্ণা দেয়, "হেই বাবা, দে দুটো মাছ ফাউ। কি বেচব বল্ দেখি, এ-ত কেনা দামে বেচতে হবে। তোর পয়সাটা পোরাবো কি দিয়ে? চেয়ে দেখ্, ও ভোম্বল, দে বাবা দুটো মাছ—"

আবার ফাউ দিলেও নিষ্কৃতি নাই। তখন আবার বলে, "কী দিলি বল্ দেখি, ও ভোম্বল, দিস্ ত দুটো ভাল দেখে মাছ দে, চলে নাই। এই দেখ্—ও বাবা, দে দুটো মাছ, খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে আমার।"

বলে আর ভোম্বলকে অন্যমনস্ক দেখিলেই একটা-দুটা মাছ টানিয়া লয়। ভোম্বলও ঝঙ্কার দেয় দস্তুরমত, "ঐ জন্যেই ত তোমাকে মাছ বেচতে চাই না। মাথা খারাপ করে দাও একেবারে। কাল থেকে তুমি অন্য পাইকেরের কাছে মাছ কিনো, আমি আর দিতে পারব না।"

তুলসীও সদম্ভে তার জবাব দেয়, "দিবিনে দিবিনে, তার অত চোখ রাঙাস্ কিসের? দিলি ত পাইকিরী মাছে জল ঢেলে। কেনা দামে বেচতে হবে— কিসে লাভ করব তাই শুনি? ওজনে আর কত মারব? এখানকার খদ্দের আবার কথায় কথায় ওজন করে। তাছাড়া তারা ফাউ টানবে না?···দে দুটো বড় দেখে—"

এবং ভোম্বলের মর্জ্জির অপেক্ষা না করিয়া নিজেই আর ঝুটা টানিয়া লয়।

কিন্তু বাড়ী ফিরিলে আর সে মানুষই নয়। মায়ে-পোয়ে পা ছড়াইয়া বসিয়া পয়সার হিসাব করে। ভোম্বল গেঁজে হইতে সব টাকা পয়সা ঢালিয়া গণিতে বসে। কোন দিন বা বলে, "আজ তাই বোধ হয় আসল থেকে ঘাটতি গেল!...না, আমারই গোণবার ভুল হলো?...এই দশ, বারো, মোট ষোল টাকা সাত আনা আছে। কালকের ছিল তিন টাকা, আর যেন কত পয়সা। ...না, কমই ত পড়ছে। বাইশ টাকার দর কিনে পঁচিশ টাকার দরে বেচলুম। লোকসান হবার ত কথা নয়। যা বেটিরা সব চুরি করে—চুরিতেই মেরে দেয়। এ বাজারে আর মাল আনব না। কাল থেকে বালিগঞ্জ যাবো—"

তুলসী সায় দিয়া বলে, "সবাই চুরি করে, সব্বাই। লুকিয়ে নেবে, সদরে নেবে—এমন করলে কি কারবার থাকে।"

সেও আঁচল হইতে টাকা-পয়সা বাহির করিয়া হিসাব করিতে বসে, "এই হলো তোর দুপাল্লা সাড়ে সাত সেরের দাম। মহাজনের চুকিয়ে আর কালকের আমার সাত আনা বাদ দিলে থাকে তেরো আনা।...মাছ বেচব কি, আমি একদিক থেকে জল দিচ্ছি, খদ্দের আর একদিক থেকে পাল্লায় দেবার আগে নিংড়ে নিচ্ছে। তার ওপর কথায় বলে 'ওজন করব', 'পাষাণ দেখি', 'পাল্লা ঘোরাও'—আর ঐ রায়েদের ছোটবাবু, মহা খচ্চর লোক। এক ঘণ্টার কম নড়বে না। আর কেবল দাম নিয়ে 'কেঁইচেপানা' করবে।"

ভোম্বল রাগ করিয়া বলে, "বেচিস্ কেন অমন লোককে মাছ! বলবি যে দেবোনা।"

তাহার পর ভোম্বল কাহাকে কত মাছ বিক্রি করিয়াছে তাহার হিসাব করে, মনে না থাকিলে তুলসীকে জিজ্ঞাসাও করে, "আচ্ছা একাদশীকে ক' পাল্লা দিয়েছি বল্ দেখি, দু পাল্লা, না তিন পাল্লা? দু' পাল্লা? তাহ'লে ত হিসেব মেলে না। দাম ত দিলে দু পাল্লারই: দেখিছিলি তুই ভাল করে?"

হিসাব সারা হইলে তুলসী রান্না করিতে যায়। ভোম্বল এক কাঁসি মুড়ি লইয়া খাইতে বসে। মুড়ি আর বেগুনি বাজার হইতে কিনিয়া আনে তুলসী।

ভাত চাপাইয়া সে-ও ছেলের কাঁসি হইতে কয়েকগাল খাইয়া যায়। কোন কোন দিন, ভোম্বলের বেশী লাভ হইলে, ঘিয়ে ভাজা কচুরী-জিলাপীও আসে। খরচা সবই প্রায় ভোম্বলের। খালি বাজার করে তুলসী আর কাপড়-চোপড়গুলি কেনে। বাড়ীতে পয়সার সম্পর্ক লইয়া কোন গোলই ওঠে না।

এইভাবেই কাটিতেছিল বেশ—

কিন্তু তুলসী আর পারে না। বয়স বাড়িতেছে বই কমিতেছে না ত! হিসাবে আজকাল তাহার প্রায়ই ভুল হয়। পয়সা কম লয়, এক এক সময় পয়সা লইতেই ভুলিয়া যায়। বাবুরা সুযোগ বুঝিয়া গা-ঢাকা দেন। কখনও কখনও কাহাকে আগের দিন ধারে মাছে দিয়াছে, পরের দিন আর চিনিতে পারে না, অপর লোককে তাগাদা করিয়া গালি খায়। ভোম্বল অনুযোগ করে, "আর কেন? তুই বাড়ীতে থাক, রান্না-বান্না কর্, খা-দা, থাক্। আমি কি তোকে দুটো খেতে দিতে পারি না?"

তুলসী মাথা নাড়ে। বলে, "তুই বুঝিস না। এই ত বাজার, একা আর কত টানবি তুই? তা ছাড়া অসুখ-বিসুখ আছে, আর একটা 'পাটা' থাকা ভালো, ও লক্ষ্মী। যে কদিন শরীর বইবে চালাবো।"

ভোম্বল রাগ করিয়া বলে, "তবে যা, রোজ রোজ ঘর থেকে চারটি করে পয়সা দিয়ে আয় বাজারে।"

তুলসীও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "ঐ জন্যে ত বলি আবার বিয়ে কর্। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যাই, তোরা দুজনে মিলে রোজগার কর, আমি একটু বুড়ো বয়সে আরাম করি। সেদিক দিয়ে যাবি না, খালি যত বাজে কথা কইবি।

ভোম্বল চুপ করিয়া যায়।

ভোম্বলের বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সেই, যেমন উহাদের ঘরে হইয়া থাকে। কিন্তু সে বধূ তিন বৎসরের বেশী বাঁচে নাই। তুলসী তাহাকে শিখাইয়া বুঝাইয়া গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল প্রায়, কিন্তু সে পরিশ্রমের ফল পাইবার আগেই মেয়েটা ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

তখন অবশ্য ভোম্বলের বয়স বেশী নয়, মোটে কুড়ি-একুশ হইবে, বিবাহের সময় তখনও যথেষ্ট আছে কিন্তু কি জানি কেন ভোম্বল কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহিল না। তুলসী প্রথমটা পরিহাস করিত, বলিত, "তুই যে ভদ্দরনোক হয়ে গেলি রে!...একবার পরিবার মলো ত আর বিয়ে করবিনা? তা বাবা ভদ্দরনোকদেরও ঢের দেখেছি, দুদিন গেলেই ওসব পিতিজ্ঞে চলে যায় রসাতলে। থাক্ দুদিন এমনি, দাগা-ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াগে যা—আপনিই আবার বিয়ের কথা পাড়বি!"

কিন্তু দুদিন কেন, ছয়মাস ঘুরিতেও ভোম্বল বিবাহের প্রস্তাব করিল না। তাহার কারণটাও তুলসীর কাছে চাপা রহিল না। ভোম্বলের চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। কেষ্টা জেলের বিধবাটা দিন-কতক নিরাপদর সঙ্গে জুটিয়াছিল, এখন আবার ভোম্বলকে ভর করিয়াছে।

তুলসী প্রথমটা রাগারাগি করিল, কান্নাকাটি করিল, অভিমান করিল, এমন কি দুই-একদিন উপবাসও দিল, কিন্তু তবু ভোম্বলকে বাগে আনিতে পারিল না। ভোম্বল ছেলে খুব খারাপ নয়, মাকে সে ভালও বাসিত, তথাপি সে এই প্রস্তাবটাতে কিছুতেই রাজি হইতে পারিল না।

তুলসী মিষ্ট কথাও যে প্রয়োগ করে নাই তাহা নহে। বলিয়াছে, "বেশত, তুই ও ছুঁড়িটাকে নিয়ে থাকতে চাস থাক্‌গে, মোদ্দা আমাকে একটা বৌ এনে দে, আমার একটু সুসার হোক। আমি আর কতকাল ঠেলব এমন করে? বৌ না হ'লে কি চলে একটা, ঘরকন্নার কাজও দেখবে আর বড় হ'লে বাজারেও বেরুতে পারবে। এমন ত আকছার হচ্ছে, কত ভদ্দরনোক করছে, তুই ত তুই!"

কিন্তু তবু ভোম্বল বাগ মানে না। ঘাড় নাড়িয়া বলে, "রক্ষে করো বাবা, দুটো মেয়েমানুষ চালানো আমার কাজ নয়।"

তুলসী রাগিয়া বলে, "আমি কি চিরকাল এমনি ক'রে তোমার হাঁড়ি ঠেলব? আমার লোহার গতর দেখেছ না কি?

ভোম্বলও সমান জোরের সহিত জবাব দেয়, "দরকার কি? আমি ত

অনেকদিন বলেছি যে, তুই বসে থাক আমি তোকে রেঁধে খাওয়াচ্ছি, ছাখ্ পারি কি না !"

তুলসী বিরক্ত হইয়া বলে, "যা যা।"

এই ভাবেই চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন অচল হইয়া উঠিল, তুলসী প্রথমটা পড়িল জ্বরে, তারপর শুরু হইল কটিবাত, একেবারে শয্যাগত। ভোম্বল সেবা-শুশ্রূষা করে, রাঁধিয়াও দেয় কিন্তু অপটু হস্তে সুবিধা করিতে পারে না। তা ছাড়া সবচেয়ে অসুবিধা হইল রাত্রিবেলাটার জন্য। দশটার গাড়ীতে মাত্‌লায় গিয়া সারারাত কাটাইয়া শেষ রাত্রে মাছ না কিনিলে মাছ পাওয়া যায় না। তারপর সকালে বাজারে আসিয়া মাছ বিলি করিতে করিতে আটটা বাজে, সে মাছের দাম আদায় হয় এগারোটায়। এই সময়টা দেখে কে ? মাছ বিলি করিয়া একবার সে বাড়ী ঘুরিয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু সে-ও আটটার আগে নয়।

একদিন বন্ধু তারাপদকে রাখিয়া গেল। তাহাকেও ভোরবেলা কারখানায় কাজে যাইতে হয়, সে দ্বিতীয় দিনে একটা ওজর করিল। ভোম্বলের সেদিন বাজার বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় রহিল না। কিন্তু তাহাতে তুলসীর ঘোরতর আপত্তি, সে বলে, "বাপ্‌রে, কারবার হলো লক্ষ্মী, কারবার বাদ দিলে চলে ! আমি থাকতুম তুই একদিন কামাই করতিস, এসে যেতোনা কিছু। দুজনেই বাড়ী বসে থাকব, তাই কখনো হয় ?"

ভোম্বল কহিল, "হয় না ত বুঝি, তোকে দেখবে কে তাহ'লে শুনি ?"

তুলসী কহিল, "সে আমার যা হয় হবে। না হয় শুয়ে-মুতে মেখে পড়ে থাকব, তুই এসে চান করাবি। কিন্তু কারবার বন্ধ দেওয়া চলবে না।"

ভোম্বল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "একটা কথা বলব, শুনবি ?"

একটা কথা যে কি তা অনুমান করিলেও তুলসী প্রশ্ন করিল, "কি ?"

বার দুই মাথা চুলকাইয়া ভোম্বল বলে, "গোলাপীকে দিনকতক এনে রাখলে কি হয় ? তুই ভালো হয়ে উঠলেই চলে যেতো না হয়।"

গোলাপী সেই কেষ্টার বিধবাটি।

তুলসী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল. "ত্যাখো—যা ভাল বোঝ করো। মোদ্দ রেধে দিতে হবে তোমাকে। আমি ও 'ভেরোষ্ট' মেয়েছেলের হাতে খেতে পারবো না।"

ভোম্বল খুশী হইয়া বলে, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।"

গোলাপী সেইদিনই এই বাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

বেশ মেয়ে সে, অসম্ভব খাটিতে পারে। একদিনের মধ্যেই বাড়ীটার যেন শ্রী ফিরাইয়া দিল। ধুইয়া-মুছিয়া, লেপিয়া-মাজিয়া সমস্ত ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিল। আর তুলসীর সেবাও চলিতে লাগিল নিটোল ভাবে, কোথাও এতটুকু খুঁত ধরিতে পারে না তুলসী। রাত্রে যখনই ডাকে, এক ডাকে উঠিয়া বসে একেবারে। ঘৃণা নাই, শ্রান্তি নাই—এ কেমন মেয়ে ?

তুলসী দেখে আর অবাক হয়, আর তত রাগিয়া ওঠে, বলে, "পোড়ার মুখি এই ক'রে আমার ছেলেকে ভুলিয়েছিস ? মর্ মর্, মরে যা তুই, ছেলের বিয়ে দিয়ে আবার সংসার করি।"

গোলাপী জবাব দেয়না, মুখ টিপিয়া হাসে শুধু।

ছুঁড়ি আবার ডাকে মা বলিয়া।

"মুখে আগুন তোমার !···লজ্জা করেনা মা বলতে ?······আশ্চর্য্য, এত লোকের ওলাউঠো হয়, তোমার হয়না !"

তুলসী পড়িয়া পড়িয়া গজ্‌রাইতে থাকে।

খুব অসহ্য হইলে গোলাপী হয়ত জবাব দেয়, "আমি মলে তোমার এ সব কন্না করবে কে ? বৌ এসে করবে ভেবেছ ? তিলেও ঠাঁই দিওনা সে কথা মনে।"

তুলসী হয়ত মনে মনে সত্যই সে কথা বোঝে। তাই খুব চীৎকার করে না, শুধু মুখভার করিয়া বলে, "করে না করে, সে আমি বুঝব। তবু ত সে আমার ব্যাটার বৌ—"

কিন্তু মজা এই, ভোম্বলের সামনে তুলসী একেবারে চুপ করিয়া থাকে, কোন কথা বলে না! গোলাপীরও আর একটি গুণ আছে, 'লাগানো' স্বভাব নাই। ভোম্বল দেখে যে মা আর গোলাপী বেশ শান্তিতেই ঘর করিতেছে, সে মনের

আনন্দে গুণগুণ করিয়া সুরু ভাঁজে আর রাঁধিতে বসে। তরকারী মাছ, গোলাপীই রান্না করে, সাগু, বার্লিও সেই রাঁধে; তাহার কাজ শেষ করিয়া উনান নিকাইয়া দিলে ভোম্বল ভাত রাঁধিতে বসে। তুলসী আর সবই খায় গোলাপীর হাতে, খালি ভাতটা ছাড়া। বলে, অন্ন পাপ মহাপাপ। এ জন্মে এই ভুগছি, আবার পাপে ডুবতে আমি পারব না।

কিন্তু রাত্রে ভোম্বল বাহির হইয়া গেলেই বিনাইয়া বিনাইয়া গালি দেয় সে গোলাপীকে, "আর জন্মে তোর কি এমন করেছিলুম যে এ জন্মে এমন শত্রুতাটা করলি। আমার বাড়া ভাতে ছাই দিলি একেবারে! একটা ছেলে নিয়ে ঘর করতে দিলি না। মর তুই—মর, মর।"

এক একদিন গোলাপী রাগিয়া যায়, বলে, "তুই মর-না বুড়ী, হাড় জুড়োয় আমাদের। দিন রাত ওঁর সেবা করব আর উনি উল্‌টে গাল দেবেন। নিজের ছেলেকে সামলাতে পারিস না, আমাকে গাল দিস্ কেন?"

তখনকার মত হয়ত তুলসী চুপ করিয়া যায়, কিংবা দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন দুর্গন্ধ তেল আনিয়া গোলাপী মালিশ করিতে বসে, গুণ গুণ করিয়া আবার শুরু করে সে, "ডাইনী আমাকে ভোলাতে এসেছে। ওরে, আমাকে অত সহজে ভোলানো যায় না। আমাকে যে ভোলাবে সে এখনও জন্মায় নি।"

গোপালী আর জবাব দেয় না।

*

এই ভাবেই দিন চলে। হঠাৎ একদিন কি কারণে তুলসীর মেজাজটা ভাল ছিল, সেই সময় গোলাপী কথাটা পাড়িল। "আচ্ছা, একটা কথা বলব মা, শুন্‌বি?"

ভনিতা শুনিয়া তুলসী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়। বলে, "কি কথা?"

"তোর ত সাজ সরঞ্জাম সবই পড়ে আছে। আমি যদি তোকে জলটল খাইয়ে দু' ঘণ্টা ক'রে বাজারে গিয়ে বসি?"

তুলসী চীৎকার করিয়া ওঠে, "আ মর্ ডাইনী, আমার সর্ব্বস্ব খেয়ে হয়

নি—আবার কারবারটিও খাবার মতলবে আছো? কেন্ লা, আমি কি আর ভালো হ'ব না মনে করেছিস্? চিরকালের মত পড়েছি না?"

গোলাপী আজকাল তাহাকে চিনিয়াছে, সে-ও আর এক পর্দ্দা গলা তুলিয়া জবাব দিল, "আরে মর্, সব কথা না শুনে চেঁচাচ্ছিস কেন? কে তোর কারবার খেতে চাইছে, তোর কারবার তোরই থাকবে···পয়সা কি আমি পুঁতে রাখব? তোকেই ত এনে দেব।"

তুলসী কথাটা ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে না। লোভ ও সন্দেহের মধ্যে দুলিতে দুলিতে বলে, "যা যা।"

"এই ছাখ! মাইরী বলছি, তোকে ছুঁয়ে বলছি! যা পয়সা পাবো, সব এনে দেবো তোকে।"

তুলসীর চোখ জলিতে থাকে, "সত্যি? ঠিক ক'রে বলছিস? তাহলে যা। কিন্তু যদি ফাঁকি দিস ত তোর ভালবাসার মাথা খাবি।"

তারপর সে গোলাপীকে ব্যাপারটা বুঝাইতে বসে। কারবারের গোপন রহস্য যা কিছু। গোলাপীও জেলের মেয়ে, জেলের বৌ—বেশী কিছু শিখাইতে হয় না তাহাকে। তুলসী সারাদিন ধরিয়া শুধু দাঁড়ি ধরিবার কৌশল শিক্ষা দিল। কেমন করিয়া দাঁড়ির মধ্য দিয়া পাল্লাবাঁধা দড়ি টানিয়া ওজন বেশী দেখাইতে হয়, পাল্লা হাতে করিয়া কতখানি ঝুলাইয়া দিলে কতক্ষণ থাকে, এই সব। সন্ধ্যা নাগাদ সাক্‌রেদের হাতযশ দেখিয়া সে খুশীই হইয়া উঠিল, বলিল, "আমাদের হ'ল মাছের কারবার লক্ষ্মী, শিখে রাখা ভালো লো—আখেরে কাজ দেখবে। রূপ-যৌবন চিরকালের নয়—"

ভোম্বল কথাটা শুনিয়া একটু খুঁত খুঁত করিয়াছিল। গোলাপীর ঠিক রূপ না থাকিলেও একটা চটক ছিল, বাজারে পাঠাইলে আবার কিসে কি হয়, তার ঠিক কি?

কিন্তু সে সব আপত্তি তুলসী একেবারেই উড়াইয়া দিল, "একা মানুষ কতই বা রোজকার করবি তুই, কতবা জমাবি। তারপর একটা অসুখ বিসুখে পড়লে তখন কি হবে? শিখে রাখা ভালো নয়?"

অগত্যা ভোম্বল চুপ করিয়া রহিল।

গোলাপী পুরাদমেই মাছ বেচিতে লাগিল। প্রথম দিন সে লাভ করিল সাত আনা, দ্বিতীয় দিন একেবারে পাঁচ সিকা। শুধু তাহাই নয়, সমস্ত পয়সাগুলিই আনিয়া সে তুলসীর হাতে দেয়, আঁচল ঝাড়িয়া দেখাইয়া দেয় যে সবই দিয়াছে কিছুই রাখে নাই।

অনেকদিন পরে হাতে পয়সা পড়িয়া তুলসীর চক্ষু জ্বলিতে থাকে, দ্বিতীয় দিনে আনন্দ চাপিতে না পারিয়া গোলাপীকে বুকে টানিয়া একটা চুমা খাইল। তৃতীয় দিনে গোলাপী আনিল এক টাকা নয় আনা। মাত্র দুপাল্লা মাছ পাইয়াছিল সে, তাও দশ আনা সের কিনিয়া দশ আনা সের বেচিতে হইয়াছে। খদ্দের তাহার ওজন দেখিতে চায় না, গোলাপী হাসি মুখে যাহা দেয়, তাহাতেই খুশী।

গোলাপী বলিল, "তোর ছেলে মাছ বেশী দিতে পারে না। আমি ভাবছি ফকির জেলের কাছ থেকে যা পারি নিয়ে নেব। কি বল্?"

তুলসী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে, "পারবি অত মাছ বেচতে? যদি পড়ে থাকে তবেই ত মুস্কিল। আমি তবু পাড়ায় ঘুরে বেচতে পারতুম—

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করিয়া গোলাপী জবাব দিল, "খুব-খুব! আধমণ মাছ পেলে তাও কেটে যায়।"

সে কাজে চলিয়া গেল। ঘর-দুয়ারের অনেক কাজই বাকী এখনও।

তুলসী সেদিন হইতে সব পয়সাই বালিশের নীচে জমাইতেছে। গোলাপী চলিয়া গেলে অতি কষ্টে ঘাড় তুলিয়া পয়সাগুলি সব বাহির করে সে, একটি একটি করিয়া আবার গোনে। না, সব ঠিকই আছে।

মিনিট কতক বাদে গোলাপীকে ডাকিল, "শুনছিস ও গোলাপী, শুনে যা—"

গোলাপী আসিয়া দাঁড়াইলে বালিশের নীচে হইতে একটা আধুলি বাহির করিয়া দিয়া কহিল, "এইটে রেখে দে কাছে। কারবারের পয়সা সব কি অমন ক'রে অপরকে ধরে দিতে আছে? মানুষের সময় অসময় আছে ত'!"

গোলাপী কিন্তু পয়সা লইল না। বলিল, "ও আমি নিতে পারব না। সে দিন যা দিব্যি দিয়েছিস।"

"ওলো, সে তুই নিজে নিলে। এ আমি হাতে ক'রে দিচ্ছি এতে দিব্যি লাগবে কেন? নে, নে—"

এমনি করিয়া তাহাদের কারবার চলে। গোলাপী প্রত্যহই সব পয়সা আনিয়া তুলসীকে ধরিয়া দেয়, কোনদিন দুই টাকা, কোনদিন সাতসিকা, কোনদিন বা আরও কম। তুলসী তাহাকে মর্জ্জিমত আধুলিটা সিকিটা দেয় আর অবিরাম প্রশ্ন করিয়া করিয়া বাজারের সমস্ত ইতিহাস শোনে। চাটুয্যেদের বড় বাবু আসিয়াছিলেন? রায়েদের সেই কালো ছেলেটা? বড্ড ঝগড়া করে সে। শিবু আসে বাজারে? একাদশী?···গোলাপী কোনদিন জবাব দেয়, কোনদিন বা খানিকটা পরে কাজে চলিয়া যায়। আবার অপরাহ্ণে ফাঁক পাইলে সেই সব প্রশ্নই শুরু হয়। কে কি বলিল, তুলসীর নাম কেহ করিয়াছিল কি না—এই সব।

মাস খানেক এই ভাবে কাটিবার পর তুলসী একদিন দুপুর বেলা ছেলেকে কাছে ডাকিয়া বসাইল। গোলাপী তখন রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছে। গলা নামাইয়া ফিস-ফিস করিয়া বলিল, "বলছিলুম কি, তুই যখন ও ছুঁড়িকে ছাড়বিই না, তখন ওর জলটা শুদ্ধু করে নে না—এমন করে আর ক'দিন হাঁড়ি ঠেলবি তুই? আমি যে সহজে ভালো হবো তা ত আর মনে নেয় না।"

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভোম্বল জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া থাকে।

তুলসী তখন গলাটা আরও নামাইয়া বলে, "আমাদের গোঁসাইয়ের ছেলেকে একটা খবর দিলে হতো না? এসে ছুঁড়িকে ভেক দিয়ে যেতো—তারপর তোর সঙ্গে কণ্ঠি বদলের বন্দোবস্ত করতুম না হয়? তা হ'লে আর কোন বেটা-বেটির কিছু বলবার থাকত না।···কি বলিস? খরচ যা লাগে না হয় আমিই দেবো।"

জামাই ষষ্ঠী

ইলিশ মাছ, মাংস, নূতন বেগুন, মিষ্টান্নের হাঁড়ি প্রভৃতি লইয়া প্রিয়নাথ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ঢুকিলেন।

"ওগো শুনছ, এই হাঁড়িটা নামিয়ে নাও দেখি আগে। গেল বুঝি পড়ে—আর কটা নিই!·· তবু এখনও আম, দই বাকি রইল। আমের যা দর, উঁকি মেরেছিলুম একবার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে—আটটার বেশি দিতেই চায় না—"

আপন মনেই প্রিয়নাথ বকিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল ইন্দ্রাণীর দিকে। এক হাতে তিনি হাঁড়িটা লইয়াছেন বটে, আর এক হাতে মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতেছেন—নিঃশব্দ কৌতুকের হাসি।

"কি হলো গো তোমার?"

ইন্দ্রাণী হাসিতে হাসিতে বাকি জিনিসগুলা নামাইয়া লইয়া রান্নাঘরে রাখিলেন। তারপর কহিলেন, "একটা মজা দেখবে! একবার ওপরে এস।"

প্রিয়নাথ ইন্দ্রাণীর এই অবস্থায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অপরাহ্ণের আর বেশী দেরী নাই, জামাই এখনই আসিয়া পড়িবে—রান্নাবান্না এখনও বাকি—এখন কি তাঁহার মজা দেখিবার সময়?

আরও একবার মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কি ব্যাপার বলো তো? আজ তোমার হলো কি?"

ইন্দ্রাণী তবুও কোন জবাব দিলেন না, অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে পিছনে আসিতে বলিয়া পা-টিপিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। অগত্যা প্রিয়নাথবাবুও তাঁহার পিছু পিছু উপরে উঠিলেন এবং দোতলার সঙ্কীর্ণ বারান্দাখানি পার হইয়া দালানে পৌঁছিলেন।

গলির ভিতরে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি, কিন্তু খুব ভিতরে নয়। মোড়ের একখানা বড় বাড়ির ঠিক পিছনেই তাঁহাদের বাড়িটা পড়ে। সেই জন্য সামনের তিনতলা বাড়িটা বড় রাস্তা আড়াল করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের শয়নকক্ষের একটা জানালা হইতে একফালি রাস্তা দেখা যায়। ইন্দ্রাণীর সঙ্কেতমত প্রিয়নাথ নিঃশব্দে শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের নববিবাহিতা কন্যা অনুকণা সেই জানালাটিতে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বড় রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। অনেকক্ষণ লোহার গরাদেতে কপাল চাপিয়া থাকার ফলে লৌহদণ্ডের দুইটা রক্তিম ছাপ নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কপালের দুইদিকে।

প্রথমে প্রিয়নাথ ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু একটু পরে তাঁহার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিল। তিনি একবার প্রসন্নমুখে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর আগের মতই চুপি চুপি নীচে নামিয়া আসিলেন।

ইন্দ্রাণী নীচে আসিয়া মন্তব্য করিলেন, "আজকালকার মেয়েদের আর বিয়ে হবার জো নেই !···ব্যস, বর ছেড়ে একটি মিনিটও থাকা চলে না।"

প্রিয়নাথবাবু জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, দোষটা আজকালকার মেয়েদেরই বটে। তুমি ঠিক ঐ জানালায় অমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে না ? যেমন মা তেমনি মেয়ে হয়েছে, ওর আর দোষটা কি ?"

তিনি ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। ইন্দ্রাণী লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য চা আনিতে গেলেন।

এক দফা মুখ-হাত ধুইয়া চা ও জলযোগের পর প্রিয়নাথবাবু আবার বাজারের দিকে বাহির হইয়া পড়িলেন। অনুকণার বিবাহের পর এই প্রথম জামাইষষ্ঠী—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই তিনি রাখিবেন না। আর রাখিবার বিশেষ কারণও ছিল না। প্রিয়নাথের আয় সাধারণ বাঙালীর হিসাবে মন্দ নয়—সন্তান ঐ অনুকণা এবং একেবারে দুগ্ধপোষ্য একটি ছেলে। সংসারে অন্য বাড়তি লোকও বিশেষ ছিল না, একটিমাত্র বিধবা বোন, তাহাতে বরং সাশ্রয়ই হইত। সে বোনেরও স্বতন্ত্র আয় ছিল।

প্রিয়নাথ চলিয়া গেলে ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি কাজে মন দিলেন। অনেক রান্না তখনও বাকি, বেলা আর বেশী নাই। ননদ শান্তির রান্না ভাল, তিনিই রাঁধিতেছিলেন, ইন্দ্রাণীর কাজ শুধু যোগাড় দেওয়া, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে জোগাড় দেওয়াতেই খাটুনি বেশী।

কিন্তু সহস্র কাজের মধ্যেও কথাটা ইন্দ্রাণী মন হইতে দূর করিতে পারেন নাই। বার বার তাঁহার নিজের প্রথম যৌবনের কথা মনে হইতেছিল। ঠিক ঐ বয়সেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং ঐভাবেই প্রত্যহ তিনি স্বামীর আগমনের দিকে পথ চাহিয়া থাকিতেন। আশ্চর্য্য! সেই বিশেষ গরাদটিতেই অনু মাথা রাখিয়াছে!···শুধু কি এখানে? পিত্রালয়ে গেলেও তিনি স্বামীর আসিবার দিনটিতে বার বার রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইতেন। এজন্য ভাইবোনদের কাছে কত লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে। ভাগ্যিস তাঁহার বাড়িতে বেশী লোকজন নাই, নহিলে আজ অনুকণারও রক্ষা থাকিত না—

কথাটা মনে হইয়া ইন্দ্রাণী আপনা-আপনিই হাসিয়া উঠিলেন। শান্তি ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আ মর্,—আপন মনে হেসে মরছিস কেন? কি হলো আজ তোর?"

দুজনে প্রায় এক বয়সী—এজন্য 'তুই-তোকারী'ই চলিত। ইন্দ্রাণী কহিলেন, "তোর ভাইঝির কাণ্ডটা একবার দেখে আয় না—সেই থেকে হাঁ ক'রে রাস্তার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—"

শান্তির মুখখানা এক মুহূর্ত্তের জন্য কেমন হইয়া গেল। এ রোগ তাঁহারও ছিল। কিন্তু একটু পরে হাসিয়া কহিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি? তুই থাকতিস না অমনি ক'রে দাদার জন্যে?"

ইন্দ্রাণী জবাব দিলেন, "আমাকেই কি তোরা ছেড়ে দিয়েছিলি? কম যন্ত্রণা সইতে হয়েছে তার জন্যে?"

শান্তি কি একটা উত্তর দিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন, কারণ অনুকণা তখন গামছা কাঁধে করিয়া নীচে নামিতেছিল, বোধ হয় গা ধুইতে যাইবে। সিঁড়ির

পাশেই রান্নাঘর, নীচে নামিয়া একবার দরজার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইল, "কি ভাজছ-গা পিসিমা, বেশ গন্ধ ছেড়েছে—"

তখনও তাহার কপাল হইতে গরাদের দাগ মিলায় নাই। সেদিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া পিসিমা জবাব দিলেন, "তুই সারাদিন আছিস কোথায় ? তোর বর খাবে, আমরা খেটে খেটে মরব না কি ? আয় দেখি এদিকে, কোমর বেঁধে লাগ্ দেখি—"

"বয়ে গেছে আমার ! তোমরা নেমন্তন্ন করেছ, তোমরা বুঝবে—"

সে মাথা দুলাইয়া কলঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ইন্দ্রাণী কহিলেন, "তোরও যেমন ! ওর প্রাণ পড়ে আছে সেই জানলার দিকে। তবে নেহাৎ 'ভাবন'টাও না করলে নয়, তাই—"

খানিকটা পরে কি একটা কাজে ইন্দ্রাণী উপরে উঠিয়া দেখিলেন, শান্তির ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইয়া অনুকণা প্রসাধন করিতেছে—। এই কাজটাতে সে খুব পটু নয়, তবু নিজেই করিতে যায়। চুল বাঁধা আর কিছুতে ঠিক হয় না, বার বার খুলিতেছে, বার বার বাঁধিতেছে। অনুকণা সুন্দরী নয়। মায়ের অসাধারণ রূপের কিছুই সে পায় নাই, বাবার ধাতে গিয়াছে—নিতান্ত সাধারণ চেহারা। কুৎসিত নয়, এই পর্য্যন্ত। সেইজন্যই তাহার প্রসাধনের শখটা খুব বেশী, কিন্তু পারিয়া ওঠে না।

দালানের ওপাশে তাহাদের আয়না-বসানো আলমারিতে ইন্দ্রাণীর চেহারাটা প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল—এখনও তাঁহার রূপ শিখার মত। ললাটে সামান্য দু'একটি রেখা দেখা দিয়াছে হয়ত, কিন্তু দূর হইতে তাহা কিছুই বুঝা যায় না। সন্তানাদি বেশী না হওয়ায় দেহের বাঁধুনি তখনও ভালই আছে—সামান্য একটু মোটা হইয়াছে বটে, তবে সে কিছু নয়। সেদিকে চাহিয়া মেয়ের প্রতি মমতায় মন ভরিয়া উঠিল। আহা বেচারি, ভগবান উহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন যখন, তখন সাজগোজ একটু দরকার বৈকি !···

তিনি ঘরে ঢুকিয়া সস্নেহে কহিলেন, "আয় আমি মাথাটা ভাল ক'রে বেঁধে দিই—"

অনুকণা ফোঁস করিয়া উঠিল, "হ্যাঁ তবেই হয়েছে আর কি! তোমাদের সে-সব সেকেলে চুল বাঁধা এখনকার দিনে চলে কি না! তাহ'লে আর আমি কারুর সামনে বেরোতেই পারব না—। তুমি যাও, আমি ঠিক বেঁধে নিচ্ছি।"

তা বটে!…মেয়ে বৎসর দুই-তিন ইস্কুলে গিয়াছিল, তাহাতেই এই। ইন্দ্রাণী ম্লান হাসিয়া কহিলেন, "একেবারেঃ কারুর সামনে বেরোনো যায় না, হ্যাঁরে—? আমাদের তাহ'লে ঘেরাটোপ পরে থাকা উচিত বল্!…যা খুশী করগে যা—"

তিনি ক্ষুব্ধ মনেই নিচে নামিয়া আসিলেন। তিনি কি এতই বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন যে, সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞানও নাই? মেয়ে কি মনে করে তাঁহাকে? ইন্দ্রাণী হিসাব করিয়া দেখিলেন মাত্র আঠার বৎসর তাঁহার বিবাহ হইয়াছে—কিন্তু অতও মনে হয় না। মনে হয় এই ত সেদিনের কথা—যখন তিনি নবোদ্ভিন্না কিশোরী! তাঁহাদের প্রণয়লীলা হইতে এখনকার কিশোরীদের প্রণয়লীলা ত কিছুমাত্র স্বতন্ত্র নয়, প্রত্যেক অভিব্যক্তিই ত এক! তবে ইহারা নবীনত্বের কী এত গর্ব্ব করে?

নীচে আসিতেই শান্তি একটা ফরমাস করিলেন, তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাহার উত্তরে ইন্দ্রাণী কিছু একটা পরিহাস করিবেন, কারণ ফরমাসের ভিতর অন্য অর্থ ছিল। কিন্তু ইন্দ্রাণী একটাও কথা না বলাতে বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, "কি হলো তোর বৌদি, মুখ অত ভার কেন?"

ইন্দ্রাণী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "কৈ না, কিছু ত হয় নি।

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিলেও কথাটা তিনি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিলেন না। কাঁটার মত খচ খচ করিতেই লাগিল। এককালে শুধু তাঁহার রূপেরই গৌরব ছিল না—প্রসাধনেরও ছিল। মনে পড়ে বিবাহের পরও কত বাড়ির কুমারী মেয়ে 'কনে দেখা' দিবার পূর্ব্বে তাঁহার কাছে প্রসাধনের পাঠ লইয়া গিয়াছে। জবরজঙ্গ তিনি কোনদিনই

ভালোবাসিতেন না, উগ্র পাউডার বা আলতা বা রঙও তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই কিন্তু তবু তাঁহার সহজ, সুন্দর পরিপাট্যে সকলেই তখন মুগ্ধ হইত। অতি বড় খুঁতখুঁতে দৃষ্টির সামনেও তিনি পরীক্ষায় পাশ লইয়াছেন···আর এই কয়টা বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহারই কন্যা তাঁহাকে একেবারে বুড়া-হাবড়ার দলে ফেলিয়া দিল।

অথচ, ঐ অনুকণা জন্মিবার পরই—ঘটনাটা ইন্দ্রাণীর মনে পড়িয়া গেল—তাঁহার সূতিকার মত হইয়া চেহারা খুব খারাপ হইয়া যায়। ঠিক সেই সময় লাহোর হইতে চিঠি আসিল যে, দীর্ঘ বারো বৎসর পরে তাঁহার জাঠশ্বশুর বাড়ি আসিতেছেন এবং আসিতেছেন শুধু ইন্দ্রাণীকে দেখিবার জন্যই। শ্বশুর ত ভাবিয়াই আকুল, স্পষ্টই একদিন বলিলেন, "বৌমা তোমার রূপের কত প্রশংসা করে চিঠি লিখেছি, এখন এই অবস্থায় দেখে দাদা কি মনে করবেন কে জানে!"

ইন্দ্রাণী হাসিয়াছিল সেদিন মনে মনে। তাহার পর জাঠশ্বশুর যখন সত্যসত্যই আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ইন্দ্রাণীর ডাক পড়িল, তখন ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া শুধু জ্যাঠামশাই-ই বিস্মিত হন নাই, তাঁহার শ্বশুরও হইয়াছিলেন। আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "বৌমা, তোমার চেহারা কি ভোজবাজিতে বদলে গেল?"···

আজ সেই ইন্দ্রাণীকে অপমান করিয়া বসিল ঐ এককোঁটা মেয়ে অনুকণা? হায় রে সতেরো বৎসর!

সহসা শান্তির কথায় যেন ইন্দ্রাণীর তন্দ্রা ভাঙ্গিল, "তুই এবার গা ধুয়ে নিলি না কেন বৌদি, প্রথম জামাইষষ্ঠী, জামাই এসেই ত প্রণাম করবে। তোকে আমাকে দুজনকেই। সন্ধ্যের ত আর দেরী নেই—"

তা বটে। ইন্দ্রাণী কহিলেন, "তা তুমিই সেরে নিলে না কেন ঠাকুরঝি?"

শান্তি হাসিয়া কহিলেন, "আমার আর সারাসারি কি, একখানা ধোয়া কাপড় পরা, এইত? নেহাৎ নূতন জামাইয়ের সামনে বেরোনো তাই। রান্নাটা এদিককার শেষ করে মাংসটা চাপিয়ে একেবারে চান করতে যাব, তুই তখন বরং একটু দেখিস। এখন আমি দেখছি। তাছাড়া সন্ধ্যে হয়ে গেল, মাথা বাঁধবি কখন?"

ইন্দ্রাণী অগত্যা হাতের সামান্য কাজটুকু সারিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। অনুকণার প্রসাধন তখন শেষ হইয়াছে, সে ওঘরে গিয়া আবার জানালায় দাঁড়াইয়াছে।

ইন্দ্রাণী মাথা বাঁধার সরঞ্জাম লইয়া আয়নার সামনে আসিয়া বসিলেন কথাটা তখনও মাথাতে ছিল, তুচ্ছ কথা বলিয়া বার বার মনকে তাড়না করিলেও একেবারে ভুলিতে পারেন নাই, তাই আয়নার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অকস্মাৎ চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। একবার পিতামহকে ভোজবাজি দেখাইয়াছিলেন, আর একবার পৌত্রীকে দেখাইবেন না কি? মেয়েকে তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয় তাহা হইলে। দোষ কি? বেমানান দেখাইবে? কিন্তু কেন?··· কী এমন বয়স হইয়াছে তাঁহার যে, সাজগোজ একেবারেই বাদ দিতে হইবে!

ইন্দ্রাণী মনে মনে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। একটু যে লজ্জাবোধ না হইতেছিল তা নয়, কিন্তু তিনি মনকে বার বার বুঝাইতে লাগিলেন যে, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। জামাইয়ের সামনে একটু পরিষ্কার হইয়া বাহির হওয়াই প্রয়োজন, আর তিনি ত এমন কিছু ঘটা করিতেছেন না। কেহ হয়ত টেরই পাইবে না যে, তাঁহার সেদিনকার বেশভূষায় কিছু পারিপাট্য আছে—

মাথা বাঁধিবার সময় ইন্দ্রাণীর হাত কাঁপিতে লাগিল।

প্রসাধন শেষ করিয়া কাপড় বদলাইতেছেন এমন সময় নীচে জামাতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ঝিকে প্রশ্ন করিতেছে, "মা কোথায় হরির মা?"

দ্রুত হাত চালাইয়া কাপড়-পড়া শেষ করিয়া ফেলিলেন তিনি। অনিল ইহারই মধ্যে আসিয়া গেল! সবে ত সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রিয়নাথবাবুও ফেরেন নাই যে তিনি অভ্যর্থনা করিবেন। শান্তির তখনও স্নান পর্যন্ত সারা হয় নাই। না, তাঁহাকেই আগে দেখা দিতে হইবে, উপায় নাই—

ততক্ষণে অনিলের পদশব্দ সিঁড়িতে শোনা যাইতেছে। অনুকণা মাথায় কাপড়ের প্রান্তভাগটুকু তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দালানের বড় আলোটা সে আগেই জ্বালিয়া দিয়াছিল—সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উজ্জ্বল আলোতে আগে তাহাকেই নজরে পড়ে, এমনি একটা গোপন ইচ্ছা বোধহয় ছিল।

হইলও তাহাই। চোখে চোখে মিলিতেই প্রচ্ছন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল দু'জনের চোখে। তবু রীতির অনুরোধে অনিল প্রশ্ন করিল, "মা কোথায়? তাঁকে প্রণাম করতে হবে যে—"

অনুকণা ডাকিল, "মা।"

মৃদু চাপা কণ্ঠে উত্তর আসিল, "এই যে যাই"—

তাহার পরই ইন্দ্রাণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উজ্জ্বল আলো তাঁহারও মুখে চোখে আসিয়া পড়িয়াছে। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেদিকে চোখ পড়িতেই বিস্ময়ে অনিল যেন পাথর হইয়া গেল। শ্বাশুড়ীকে সে ত কতবারই দেখিল, কিন্তু তিনি কি এত রূপসী, তাঁর এত অল্প বয়স? সে পলকহীন চোখে চাহিয়াই রহিল, প্রণাম করার কথা মনেও পড়িল না।

অনুকণারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সহজ কবরী রচনা, সামান্যতম পাউডার এবং সাধারণ একখানা ঢাকাই শাড়ী এমন ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারে? আশ্চর্য্য!

ইন্দ্রাণী যখন প্রসাধন করিয়াছিলেন, তখন একমাত্র কন্যার অবহেলার প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাটাই নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল, আর কোন কথা তাঁহার খেয়াল ছিল না। জামাতার কথাটাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন অনিলের বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ছি, ছি,—জামাই কি ভাবিতেছে।…কেন মরিতে তিনি এ কাজ করিলেন, এখন যে ছুটিয়া পলাইবারও উপায় নাই।

ইন্দ্রাণী মাথা নত করিতে অনিলেরও সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে চারিটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল।

"পিসিমা কোথায়, মা?"

"আসছেন বাবা। তুমি ওঘরে বোসো, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি"—বলিয়া তিনি একরকম ছুটিয়াই শান্তির ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। তখন মনে হইতেছে, 'ধরিত্রী দ্বিধা হও।' পিছন হইতে জামাতার কণ্ঠস্বর কানে আসিল, চুপি চুপি অনুকণাকে বলিতেছে, "মাকে বেশ মানিয়েছে, না?"

একটা শুষ্ক 'হুঁ' বলিয়া অনুকণাও এ ঘরে আসিল। তখন তাহার বিস্ম রীতিমত উষ্মায় পরিণত হইয়াছে। সে আসিয়া চাপা গলায় ভৎর্সনার সুরে মাকে বলিল, "ছি ছি, মা, কি করেছ? জামাইয়ের সামনে এমনি করে বেরোয় কি মনে করলেন উনি বলো দেখি!...তুমি না হয় লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে আমরা মুখ দেখাই কি ক'রে?"

খুব বিচলিত না হইলে এ ভাষা অনুকণার মুখ দিয়া বাহির হইত না।

জবাব ইন্দ্রাণীর মুখের কাছেই আসিয়াছিল। একবার ভাবিলেন তিনি বলেন, কেন রে, আমি ত কিছুই জানি না। তাছাড়া তোর মত রুজ-লিপষ্টিক পেণ্ট-রঙ্গীনকাপড় কিছুই ত ব্যবহার করি নি। তবে তোর অত ঝাল কেন কিন্তু কি যেন একটা দুর্নিবার লজ্জা আসিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল তিনি কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। কন্যার উপর বিজয়গর্ব্বের কণামাত্র ভোগ করা হইল না। দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়া নামিতেই প্রিয়নাথের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি তখন দ্বিতীয় দফার বাজার সারিয়া ফিরিতেছিলেন। বাড়ীতে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রশ্ন করিলেন, "কী গো, জামাই এসে গেছে না কি?"

তখন আলো-আঁধারে অতটা ঠাওর হয় নাই। এখন উঠানে পা দিতেই ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়াই চোখ ধাঁধিয়া গেল তাঁহার। মুহূর্ত্তের জন্য হয়ত চোখে মুগ্ধ দৃষ্টিও ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে কহিলেন "এ করেছ কি? আজকের দিনে এম্‌নি ক'রে সাজে? জামাই দেখলে কি ভাববে বলো দেখি—। হয়ত মনে করবে যে তুমিই তার মন ভোলাতে চাও—"

"চুপ!"

অকস্মাৎ ইন্দ্রাণী ঢাকাই শাড়ীর আঁচলটা গা হইতে খুলিয়া লইয়া চড় চড় করিয়া খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার পর হাঁফাইতে হাঁফাইতে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "হ'লো ত? বাপ-বেটীর মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লো ত?...এখন হরির মার একখানা ছেঁড়া কাপড় এনে দাও, পরি।"

হতভম্বের মত খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "কি হ'লো আবার ?"

"হবে আবার কি ? আমি তোমাদের বাড়ীর দাসীবাঁদী, সে কথা ভুলে একখানা ফরসা কাপড় পরেছিলুম, এই ত আমার অপরাধ ? যাক্—সে অপরাধ আর হবে না। ঐ হরির গার কাপড় পরেই জামাইয়ের সামনে বেরোব—"

শান্তি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে বৌদি ?"

ইন্দ্রাণী একেবারে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ রাখিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, "আমার জামাই হয়েছে বলে এয়োস্ত্রীর লক্ষণ করবারও উপায় নেই ঠাকুরঝি, এরা যা মুখে আসে তাই বলে।"

প্রত্যহ

রমেশের হিসাব মিলাইতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। সাধারণতঃ মাহিনার দিন হইলে তাহার একটু বেশী রাত্রিই হয়, তাহার উপর সেদিন তাহার সহকারী ক্যাশবাবুটি আসেন নাই। সুতরাং অতবড় অফিসের সকলকে মাহিনা দিয়া হিসাব মিলাইয়া ক্যাশ বন্ধ করিতে একটু বেশী দেরী হওয়া বিচিত্র নয়।

রমেশ চেয়ার হইতে উঠিয়া খানিকটা হাত-পা ছড়াইয়া লইল, তাহার পর হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল! সে মফস্বল হইতে আসে, দশটা চল্লিশে তাহার শেষ গাড়ী। এ গাড়ী ফেল হইলে আর যাওয়ার উপায় নাই। সে তাড়াতাড়ি লোহার সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া চেয়ার হইতে কোটটা তুলিয়া হাত গলাইতে গলাইতে দারোয়ানকে ডাকিতে চলিল। দারোয়ান এতক্ষণ শুইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে অন্তত মিনিট তিনেক না ডাকিলে সাড়া পাওয়া যাইবে না। রমেশ ভাবিয়া দেখিল, তাহার অফিসের সাহেব হইতে দারোয়ান পর্য্যন্ত সকলেই আহারাদি সারিয়া এতক্ষণে বিশ্রাম করিতেছে শুধু তাহারই অফিসের কাজ এখনও শেষ হয় নাই—

একতলায় নামিয়া দারোয়ানের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে সহসা তাহার মনে পড়িল যে তাহার নিজের মাহিনা টেবিলের ব্লটিং-প্যাডের তলায় গোঁজা আছে ; আজ আর টাকাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না, আসিবার সময়ই সুরবালা বলিয়া দিয়াছে, পার ত কলকাতা থেকে দু-একটা জিনিস নিয়ে এসো, বাড়ী মহাদেবের ঘর-কন্না হয়ে আছে, না আছে হাতে পয়সা, না আছে একটা জিনিস।

সে আবার তিনতলায় উঠিল। এত রাত্রে লিফ্‌ট্ বন্ধ, অত উঁচু অফিস বিল্ডিং-এর সিঁড়ি ভাঙ্গা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু বেড়া-দেওয়া ক্যাশঘরে ঢুকিয়া টেবিলের প্যাড্‌খানা তুলিতেই তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল। টাকা কৈ ? তবে কি—, সে তাড়াতাড়ি শার্ট ও কোটের পকেটে হাত বুলাইয়া লইল, কিন্তু সেখানেও ত নাই !

অকস্মাৎ তাহার যেন কেমন বিহ্বলতা আসিল। হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, কপালে ঘাম দেখা দিল ; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ঐভাবে মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিবার পর পাগলের মত চারিদিক খুঁজিতে লাগিল। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের অসংখ্য দলা পাকানো কাগজ একটি একটি করিয়া তুলিয়া দেখিল তাহার পর আলমারীর নিচে, চেয়ারের নিচে দেশলাই জ্বালিয়া, হামাগুড়ি দিয়া অনেক করিয়া দেখিল ; কিন্তু কোথাও সেই আটখানি দশটাকার নোটের তাড়াটি নজরে পড়িল না। আধঘণ্টা খোঁজা-খুঁজির পর সে অবসন্নভাবে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

নিশ্চয়ই কেহ চুরি করিয়াছে। কিন্তু কে করিল ?

তাহার নিজের মাহিনার টাকা সই করিয়া প্যাডের নীচে রাখিবার পর হইতে যে যে তাহার ক্যাশঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছে, সকলকেই সে মনে করিয়া দেখিল কিন্তু তাহারা ত কেহই চুরি করিবার মত লোক নয় ! রামবাবু, কেশববাবু, হরিলাল, সুখন্—সকলকেই সে বহুদিন ধরিয়া চেনে, তবে কাহাকে সে সন্দেহ করিবে ?

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, ট্রেনের আর কোনও আশাই নাই। আহারাদির পথ বন্ধ। অথচ ক্ষুধায় যেন পেটে মোচড় দিতেছে ;

বাহিরে হয়ত খাবারের দোকান এখনও খোলা আছে কিন্তু পয়সা কোথায় ? পকেট যে একেবারে খালি ! তাছাড়া যদি মাহিনার টাকা না পাওয়া যায় ? পরের অবস্থাটা সে কল্পনাই করিতে পারিল না।

আর একবার সে ঘরের কাগজপত্র সরাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, বেড়া দেওয়া ক্যাশঘরের বাহিরে চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিল কিন্তু যাহা নাই, কিছুতেই তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। হতাশভাবে রমেশ একবার অফিস ঘরটার দিকে চাহিল, অন্ধকারে অসংখ্য টেবিল সার সার যেন নিঃশব্দ প্রেতমূর্ত্তির মতই তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। সে কতকটা ভয়েই আর উপরে থাকিতে পারিল না, আবার নীচে নামিয়া আসিল।

কিন্তু মাঝামাঝি আসিয়াই অকস্মাৎ তাহার একটা সন্দেহ হইল। সে ভুলিয়া টাকাটা আবার ক্যাশের সঙ্গেই তুলিয়া রাখে নাই ত ? টেবিলের উপরেই নোট ও টাকার গোছা গুনিয়া গুনিয়া থাক দিয়া রাখিয়াছিল, তুলিবার সময় ঝুপঝাপ তুলিয়া রাখিয়াছে। রমেশ ঊর্দ্ধশ্বাসে একসঙ্গে দুই তিনটি ধাপ ডিঙ্গাইয়া উপরে আসিল তাহার পর কোনমতে লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া ক্যাশের থলিটা বাহির করিয়া গুনিতে বসিল। দেখিল ঠিক তাই, নির্দ্দিষ্ট ক্যাশের উপর ঠিক আশীটি টাকা বেশী আছে !

আনন্দে, শ্রান্তিতে সে মিনিট-দুই চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল, তারপর টাকাগুলি এবার সাবধানে কোটের ভিতরের পকেটে রাখিয়া ক্যাশের থলি পুনরায় সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া চাবি দিয়া নামিয়া আসিল। এবার নিশ্চিন্ত, তাড়া নাই, দুর্ভাবনা নাই, শুধু শারীরিক দৌর্ব্বল্যে পা দুইটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

দারোয়ানকে দুই তিনবার ডাকিবার পর সে উঠিয়া আসিয়া দ্বারের চাবি খুলিয়া দিল, তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে কহিল, "কেৎনা বাজা বাবু ? দশ হোগা ?"

কোনমতে একটা 'হুঁ' বলিয়া রমেশ বাহির হইয়া পড়িল। দারোয়ান পিছন হইতে আপ্যায়নের স্বরে কহিল, "আজ তো বহুত রাত হুয়া আপকা। ক্যাশকা কামমে বহুৎ তক্‌লীফ্ হ্যায়।"

বাহিরে আসিয়া সহসা যেন মনে হইল, সমস্ত সৃষ্টি মরিয়া গিয়াছে। ডালহাউসী স্কোয়ারে বিপুল জনতার তখন আর কোন চিহ্ন নাই, অফিস ঘরগুলি সব বন্ধ, গাড়ী নাই, ঘোড়া নাই, মানুষ নাই, শুধু সেই অদ্ভুত নির্জ্জনতার মধ্যে রাস্তার আলোগুলি নীরবে জ্বলিয়া যাইতেছে। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। দ্রুত হাঁটিয়া আসিয়া লালবাজারের মোড়ে পুলিশের মুখ দেখিয়া যেন সে বাঁচিল। মনে হইতে লাগিল পুলিশের চেয়ে মানুষের এমন আত্মীয় আর নাই।

বৌবাজারের রাস্তায় তখনও দুই-একটি খাবারের দোকান খোলা ছিল। কিন্তু তাহারই একটার সামনে আসিয়া সহসা মনে পড়িল যে পকেটে পয়সা নাই। এতরাত্রে দশটাকার নোট বাহির করিয়া ভাঙ্গাইতে তাহার সাহস হইল না। একটিই মাত্র পয়সা ছিল, একটা উড়ের দোকান হইতে এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া রাস্তা দিয়া খাইতে খাইতে পথ চলিতে লাগিল এবং শিয়ালদার মোড়ে আসিয়া সরকারী ট্যাঙ্ক হইতে জল খাইয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল।

কিন্তু এখন যায় কোথায়? কলিকাতায় যে আত্মীয় আছেন তিনি থাকেন টালায়, এতরাত্রে টালায় গিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে মজুরী পোষাইবে না। অগত্যা সে বেলেঘাটা স্টেশনেই যাওয়া স্থির করিল এবং সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের সামনের বেঞ্চে গিয়া আশ্রয় লইল। সৌভাগ্যক্রমে পাহারাওলাটা তাহার মান্থলি টিকিটটা দেখিয়া আর বিশেষ গোলযোগ করিল না, সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আশ্রয় পাইল, বেঞ্চিও পাইল বটে কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না; পকেটে টাকা ছিল বলিয়া ভরসা করিয়া ঘুমাইতেও পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া বাকি রাতটুকু কাটাইয়া দিবে সঙ্কল্প করিল।

যতক্ষণ আশ্রয়ের দুশ্চিন্তা ছিল, ততক্ষণ কোন কথা মনে পড়ে নাই, এখন সুস্থ হইয়া বসিয়াই তাহার বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সুরবালা নিশ্চয় এখনও জাগিয়া বসিয়া আছে, এবং আকাশ পাতাল ভাবিতেছে।

প্রায় আট বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একদিনও সে বাড়ীর বাহিরে রাত কাটায় নাই,—এ-ই প্রথম। সে বেচারীর দুশ্চিন্তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক! রমেশ মানস চক্ষে দেখিতে পাইল বাড়ীর অবস্থাটা, ছেলে মেয়েরা সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঝি নীরো এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, শুধু সুরবালা এখনও দালানে কিম্বা রান্নাঘরের দাওয়ায় জাগিয়া বসিয়া আছে, তাহার চোখে নিদ্রা নাই। রান্নাঘর এখনও সারা হয় নাই নিশ্চয়, রাত হওয়া তাহার আশ্চর্য্য নয় বলিয়া সুরবালা প্রথমে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় নাই, এখন দুশ্চিন্তা হওয়া সত্ত্বেও কোন খোঁজখবর করিতে পারিতেছে না, শুধু ছট্ ফট্ করিতেছে নিজেই; কারণ পাড়াঘরে আর কেহই জাগিয়া নাই, কাহাকে ডাকিবে?

সুরবালা তাহার জন্য ঘর-বার করিতেছে এই কথাটা যতই ভাবিতে লাগিল, রমেশের কেমন যেন বিস্ময় বোধ হইল। সুরবালাকে এমন করিয়া এতকাল ভাবিয়া দেখে নাই। সুরবালা যে তাহার জন্য উৎকণ্ঠায় জাগিয়া রাত কাটাইতে পারে এই কথাটার মধ্যেই যেন কতটা বিস্ময়! সে তাহার স্ত্রী, একথাটা যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। প্রতি দিন-রাত্রি তাহার সঙ্গে ঘর করিয়াছে, এই সাত আট বৎসর তাহার সংসারের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে সে মিশিয়া আছে সত্য কথা কিন্তু তাহা যেন অতি সাধারণ ঘটনা, মাথা ঘামাইবার মত কোন ব্যাপার নয়।

মনে পড়িল তাহার প্রতিদিনের অভ্যাসের কথা। অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখে, সুরবালা রান্নাঘরে রাঁধিতেছে এবং অবিশ্রাম বকিতেছে। বড় মেয়েটা রান্নাঘরের দাওয়ায় হ্যারিকেনের আলোতে বই লইয়া বসিয়াছে, কিন্তু সেটা উপলক্ষ মাত্র, আসলে ভাই বোনদের সহিত খুনসুড়ি করিতেছে। বাকী ছেলেমেয়েগুলির বকাবকি-চেঁচামেচি ও মারামারিতে আকাশ মুখরিত; ছোট মেয়েটা দিনরাতই কাঁদে—একে ভগ্নস্বাস্থ্য তার উপর দেখিবার লোক নাই বলিয়াই বোধ হয়।

রমেশ বাড়ী ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া এক গ্লাস মিছরীর জল খায় তারপর আস্তে

আস্তে চটিটা পায়ে গলাইয়া আবার বাহির হয়। প্রায় প্রত্যহই সুরবালা বলিয়া দেয়, একটু সকাল ক'রে ফিরো, কিন্তু কোনদিনই সে ফেরে না। বহুরাত্রি পর্য্যন্ত বোসেদের বাড়ী তাস খেলিয়া গভীর রাত্রে ছেলেরা সব ঘুমাইয়া পড়িলে তবে বাড়ী ফেরে, তাহার পর কোন মতে খাইয়াই শোওয়া।

বেচারী সুরবালা!

ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব ত একা তাহারই নয়। অথচ সমস্ত ঝঞ্ঝাট তাহাকেই পোহাইতে হয়। তাহার দিকটা-ত রমেশ কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই! উদয়-অস্ত খাটুনি, এতগুলি ছেলেমেয়ের অসুখ-বিসুখ এবং রকমারী ঝঞ্ঝাট। একদিনও কোথাও যাইতে পায় না, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিবার উপায় নাই, জীবনে কী সুখ আছে তাহার? সে যদি খিটখিটে হয় কিম্বা একটু বেশী বকে ত আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

রমেশ কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল যে সুরবালা নাই, সে একা সংসারের ভার বহন করিতেছে—কথাটা ভাল করিয়া ভাবিবার পূর্ব্বেই যেন দম বন্ধ হইয়া আসিল। অথচ যে লোকটা বিনা আপত্তিতে প্রতিদিন এই ভার বহন করিয়া যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে রমেশ ত কোন দিন বিবেচনা করে না! বরং স্নান করিয়া আসিয়া কাপড়টা পাইতে বিলম্ব হইলে কিম্বা কোনদিন ভাত রাঁধিতে এতটুকু দেরি হইয়া গেলে রাগিয়া আগুন হয়।

নানা চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে বাকী রাতটুকু কাটিয়া গেল। ভোরের ট্রেনের সময় হইয়াছে দেখিয়া সে প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। প্রত্যুষের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাড়ীতে যাইতে যাইতে ঘুমে তাহার চোখ দুটি ঢুলিয়া আসিল, তাহারই মধ্যে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে আজ হইতে সুরবালা কিম্বা তাহার সংসার হইতে পলাইয়া বেড়াইতে চেষ্টা করিবে না। তাহার কাজের, তাহার দুঃখের অংশভাগী হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অর্দ্ধেক দায়িত্ব বহন করিবে—

ঘুমের ঘোরে রমেশ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, সে অফিস হইতে ফিরিয়া রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া মেয়েকে পড়া বলিয়া দিতেছে এবং কোলে ফেলিয়া ছোট

ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সুরবালা রান্নার ফাঁকে ফাঁকে তাহার সহিত দুই-একটি কথা বলিয়া যাইতেছে; তাহার দৃষ্টি প্রসন্ন, মুখে আনন্দের লালিমা—

রমেশ যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। বাগানের বেড়া পার হইতেই কানে গেল ছেলে-মেয়েগুলির সম্মিলিত চীৎকার। বাড়ীর উঠানে পা দিয়া দেখিল সুরবালা মেজ ছেলেটাকে উঠানে ফেলিয়া বেদম ঠ্যাঙ্গাইতেছে, আর সেটা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। সুরবালা মারিতেছে যত, আস্ফালন করিতেছে তাহার অনেক বেশী—"আর পারি না আমি, আমায় যেন সব পাগল ক'রে তুলেছে! মর, মর তোরা সব কটা, আমার হাড় জুড়োক।"

সুরবালার দেহে আর যৌবনের চিহ্নমাত্র নাই। তাহার উপরে গতরাত্রির দুশ্চিন্তা ও রাত্রি জাগরণে তাহাকে বিশ্রী দেখাইতেছে। বাড়ীর বাসি-পাট তখনও হয় নাই, গতরাত্রির ছেলেমেয়েদের অত্যাচারের চিহ্ন উঠানের চারিদিকে, ছোট মেয়েটা তিন চার জায়গায় অপকর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছে, এখনও পরিষ্কার করা হয় নাই। চারিদিকে আবর্জ্জনা ও অশান্তি যেন স্তূপীকৃত হইয়া আছে—

তাহাকে দেখিয়া সুরবালা মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল, "কাল সারারাতই আপিস করলে? ভেবে মরি আর কি! সারারাত হাঁড়ি-বেড়ি কোলে ক'রে বসে।...এই বাঁদর, আবার যাচ্ছিস? এত মার খেলি তবু চৈতন্য হয় না? এঁ্যা—"

কাপড় জামা ছাড়িয়া রমেশ চটি পায়ে দিয়া বাহির হইতেছে, সুরবালা কহিল, "এসেই আবার চললে কোথায়? কাল সারারাত খাওয়া নেই, ঘুম নেই একটু জিরোলে হত না?"

রমেশ মাথাটা চুলকাইয়া কহিল, "বিধুবাবুর ওখানে যাচ্ছি, একটু বিশেষ দরকার আছে—"

কক্ষ-চ্যুত

ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, টানা টানা ডাগর চোখ, ছিপছিপে গঠন, অত্যন্ত কোমল ভঙ্গুর দেহ এবং গৌর বর্ণ—প্রায় মেয়েলি ব্যাপার! জানুয়ারীর শেষের দিকে এসে ভর্ত্তি হ'ল আমাদের ক্লাসে, আর ক্লাসে ঢুকে একবার মাত্র এদিক ওদিক চেয়ে আমারই পাশে এসে বসল। নামটি জানলুম জিজ্ঞেস ক'রে—কমল।

সেই থেকেই তার সঙ্গে আমার একটু বেশী ভাব। কে জানে কেন, সে সকলকার সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারত না, বড্ড মুখচোরা গোছের ছিল। তার যত মনের কথা সব আমাকেই সে বলত, আর সঙ্গে সঙ্গে সাবধান ক'রে দিত, "বলিস্‌নি যেন ভাই কাউকে!"

ফোর্থক্লাসের ছেলের এমন কিই বা গোপন কথা থাকতে পারে, তবু তার সঙ্কোচের অবধি ছিল না। এর জন্যে তাকে লাঞ্ছনাও কম সইতে হয় নি! হেবো ছিল আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ফক্কোড় ছেলে, সে ত ওর নামই দিয়েছিল—'কমলদি'! আরও কত রকম ক'রে ক্ষ্যাপাত সবাই, তবে একটা সুবিধা ছিল এই যে, ও বিশেষ রাগ করত না তাতে, বরং ঘাড়টি নীচু ক'রে মুখ টিপে টিপে হাসত।

ওর বেড়াতে যাওয়াও ছিল অদ্ভুত। খেলাধূলোর ধার দিয়েও ঘেঁষত না, বল্‌ত, "ও বড় চোয়াড়ে ব্যাপার। আমার বড় ভয় করে, কী জানি যদি হাত-পা ভেঙ্গে যায়?" ওর জন্যে আমাকেও ফুটবল খেলা ছাড়তে হলো। বিকেলে রোজ টেনে নিয়ে যেতো নস্করদের ঝিলের ধারে, সেখানে গিয়ে নির্জ্জনে নিরিবিলি দেখে বস্‌তো, সন্ধ্যে হ'লে আবার বাড়ী ফিরে আস্‌ত। এই ছিল নিত্যকার ঘটনা। ঝিলের ধারে গিয়ে খানিকটা বসে থাকবার পরই আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ত ও, আর বক্‌বক্‌ ক'রে বকে যেত অবিশ্রান্ত।

নানা রকমের স্বপ্ন ছিল ওর, কোন দিন বলত, "বড় হয়ে ভাই আমি ইঞ্জিনীয়ার হবো, বুঝলি? বিরাট একটা পোল তৈরি ক'রে ভারতবর্ষের সঙ্গে সিংহলকে দেবো জুড়ে। কত সুবিধে হবে বল দেখি তাতে? আরও একটা কাজ করতে হবে, হরিদ্বার থেকে বদ্রী নারায়ণ, শুধু বদ্রী নারায়ণ কেন, গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত একটি রোপওয়ে তৈরী ক'রে দেবো যাতে যাত্রীরা ট্রেনে চেপেই যেতে পারে। আমার ঠাকুমা গত বছর গিয়েছিল, বড্ড কষ্ট!"

কোন দিন বা বল্‌ত, "বড় হয়ে ডাক্তারীটা পড়ে ফেলতে হবে। এম্‌নি ডাক্তার হবো না, মানে ব্যবসা করার জন্য নয়। কঠিন কঠিন রোগের ওষুধ বার করবো, এই হবে আমার কাজ। আমার দিদি টাইফয়েডে মারা গেল সেবার, একটা ডাক্তারও কিছু করতে পারলে না। বলে ও রোগের কোন ওষুধ নেই। ছি, ছি—"

আবার এক একদিন বলত, "না, সাহিত্যিক হ'তেই হবে। দেখছিস্ ত রবিঠাকুরের কত খাতির। বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে—সাহিত্যিক হওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

এমনি ভাবেই দিন চলত। পড়াশুনোয় কমল ছিল মাঝারী, ইস্কুল-ম্যাগাজিনে প্রায়ই কবিতা লিখ্‌ত, তাও মাঝারী গোছের, তবে বই পড়তে পারত খুব, মেধাও ছিল অসাধারণ, একবার পড়লে আর ভুলতে চাইত না। যদিও পড়ার বই কিছুতে ছুঁতো না।

মনে আছে ম্যাট্রিকের যেদিন ফল বেরোল, সেদিনকার কথাটা। ভোর-বেলাই খবর পেয়েছি ফলাফল টাঙিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি যেতে পারি নি, আগের দিন অন্ধকারে পা মচকে পড়ে ছিলুম। ন'টা নাগাদ কমল এসে পড়ল লাফাতে লাফাতে। প্রশ্ন করলুম, "কী হলো রে?" সে উত্তরে আমার কোলের মধ্যে বসে পড়ে আমাকে সজোরে জড়িয়ে ধরলে, তারপর হঠাৎ আমাকে একটা চুমো খেয়ে বললে, "বুঝতে পারছিস্ না?"

বুঝতে পারলেও শুনতে চাইছিলুম। তখন সে বললে, "তুই আর আমি দু'জনেই পাশ করেছি, ফার্স্ট ডিভিসনে—।"

তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কি আদর তার! এমনি ছিল কমল, আমাদের স্কুল জীবনে।

কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে উঠে সে যেন সহসা একেবারে বদ্‌লে গেল। আমাকে কিচ্ছু না ব'লে একদিন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে ভর্ত্তি হয়ে ব্যায়াম শুরু ক'রে দিলে। চুলগুলো হয়ে উঠল ওর উস্‌কো খুস্‌কো, চোখের ভাব উদাস। আরও কিছুদিন যেতে দেখি কলেজের বইয়ের ভেতরে ক'রে মার্কস্‌বাদ জাতীয় বই এনে পড়তে শুরু করেছে। ফলে ওর চেহারারও যেমন দ্রুত পরিবর্ত্তন হ'তে লাগল, মনেরও তেমনি। ঢ্যাঙ্গা ছিল ও বরাবরই, তার সঙ্গে বলিষ্ঠতা যুক্ত হয়ে ওর সেই মেয়েলি ভাবটা একেবারেই চলে গেল। আর কথাবার্ত্তাও গেল বদলে—ইদানীং দশটা কথা কইলে তার মধ্যে তিনটে 'বুর্জোয়া' এবং চারটে 'পুঁজিবাদ' শব্দ ব্যবহার করে। আগে আমার বাড়ীতে কাট্‌ত ওর দিনে আট ঘণ্টা ক'রে, এখন তিন দিনেও একবার দেখা পাই না। এলেও আগেকার সে অন্তরঙ্গতা যেন প্রকাশ পায় না—খানিকটা সমাজতন্ত্রবাদের ওপর বক্তৃতা ক'রে একসময় হঠাৎ উঠে চলে যায়। ব্যাপার দেখে দুঃখিত হই, কিন্তু উপায় খুঁজে পাই না।

তবু যাহোক্ চলছিল—থার্ড ইয়ারে উঠে কমল অন্য কলেজে ভর্ত্তি হ'তে দেখাশুনো প্রায় বন্ধই হয়ে এলো। দু-তিন মাসে একদিন। শুনলুম সে পড়াশুনো ছেড়ে কম্যুনিজ্‌ম্ নিয়ে খুব মেতেছে, এখানে ওখানে বক্তৃতাও দেয়! ছাত্রসভার না কি হয়েছে ও সভাপতি। আমাদের মত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার সময় কৈ?…ফোর্থ ইয়ারে উঠে ওর সাক্ষাৎ হয়ে এলো আরও বিরল, ছ'মাসে একদিন। একেবারে বি, এ পরীক্ষার দিন হঠাৎ খবর পেলুম ও পরীক্ষা দেয় নি। যদিও ওর ফল ভাল হওয়ার কথা। সন্তোষের কাছে নাকি বলেছে, "বি, এ পাস করাটা ভাল্‌গারিটি। তা ছাড়া ডিগ্রীটা ক্যাপিটালিজ্‌ম্-এর দিকে টানে, বিয়ের বাজারে দর বাড়ায়, ওতে কোন কাজ নেই আমার।"

শুনে দুঃখিত হলুম। তার বেশী কিছু করার ছিল না আমার, আমার জীবনে তখন নূতন স্বার্থ, নূতন স্বপ্ন দেখা দিয়েছে। তাদেরই ভীড়ে কমল কবে একেবারে হারিয়ে গেল, টেরও পেলুম না। অনেকদিন পরে একদিন ওর বাড়ীতে খবর দিতে গিয়ে শুনলুম, কাউকে কিছু না ব'লে কোথায় চলে গিয়েছে সে।

একটু হয়ত মনটা খারাপ হয়েছিল তখন, তারপর ভুলেই গেলুম।

এরপর তার সঙ্গে আবার দেখা চার বৎসর পরে।

কাশীতে নেমে সাইকেল-রিক্সা দর করছি, হঠাৎ দূর থেকে একখানা সাইকেল-রিক্সা খুব জোরে হাঁকিয়ে এসে আমার কাছে দাঁড়ালো, তারপর তার চালক পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, "সুধাংশুবাবু, আমার গাড়ীতে আসুন না!"

একি?

এ যে কমল!

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথাই বেরোল না। একবার মনে হলো ভুল দেখছি। কিন্তু না, রংটা পুড়ে গেছে, দেহের বলিষ্ঠতাও যেন পরিশ্রমে গেছে পাকিয়ে, তবু তার সেই বিগত-লাবণ্য মুখের মধ্যে কমলের পরিচয় রয়েছে সুস্পষ্ট হয়ে। আর কণ্ঠস্বর! সে-ত ভুল হবার নয়! দীর্ঘ চুলগুলো বিবর্ণ হয়ে জট পাকাবার দিকে এগিয়ে গেছে, গায়ে একটা ছেঁড়া হাফ শার্ট, পরণের ধূতি মালকোঁচা মারা এবং সুবিধার জন্য অনেকখানিই গুটোনো, মুখে দাড়িগোঁফের কলঙ্ক – এই অবস্থায় সে রিক্সা চালাচ্ছে।

কিন্তু তখন বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ছিল না, চারিদিকের অন্য হিন্দুস্থানী রিক্সাওয়ালারা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। অতি কষ্টে গলা পরিষ্কার ক'রে বললুম, "এ সব কি কমল?"

বলাই বাহুল্য, কমলের মুখের চেহারা গোড়া থেকেই সপ্রতিভ, প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে বললে, "না চিনলেও ক্ষতি ছিল না সুধাংশুবাবু,

মানীলোকের সম্মান রাখতে জানি। আমার শুধু বক্তব্য এই যে রিক্সা যদি চড়তেই হয় ত আমার গাড়ী চড়লে ক্ষতি কি? Fair competition!"

উত্তর দেবার অনেক কিছুই ছিল কিন্তু তখন আমি পালাতে পারলে বাঁচি। সোজা ওর গাড়ীতে চড়ে বসলুম। কুলী স্যুটকেশ আর বিছানাটা পায়ের কাছে রেখে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

কমল তেমনি শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "কোথায় যেতে হবে বাবু?"

ওর ন্যাকামী দেখে রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বললুম, "চুলোয়!...for God's sake এখান থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে চলো—"

সে ব্যাপারটা বুঝল। একটু মুচকি হেসে সিক্রোলের সোজা পথটা ধরে জোরে খানিকটা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা নির্জ্জন গাছতলায় দাঁড় করিয়ে বললে, "এবার ভেবে জবাব দিন—"

এবার আমি রীতিমত ধমক্ দিয়ে উঠলুম, "আবার 'দিন'! ও কী হচ্ছে?"

কমল ঘাড় নেড়ে বললে, "না না, যেদেশে যা। তোমার আমার মধ্যে যে gulf of difference রয়েছে সেটা ভুলে গেলে চলবে না! তোমরা মধ্যবিত্ত বাবু, কেরাণীগিরি করো কিম্বা বড় জোর সম্প্রতি লণ্ড্রী বা মনোহারীর দোকান খুলেছ, রিক্সাওলার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পেলে আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হবে যে!"

আমি বললুম, "তা যদি জানো ত দেখা দেবার দরকারই বা কী ছিল!"

সে মাথা নেড়ে বললে, "বা, আমাকে রোজগার ত করতে হবে! যেটুকু fair, তার বেশী আমি চাইছি না—"

"দ্যাখো, fairness-এর নাম ক'রো না। প্রথমত, গোড়াতেই তুমি আমার পরিচয়ের সুযোগ নিয়েছ, সেটা অন্য রিক্সাওয়ালাদের প্রতি মোটেই fair হয় নি। তা ছাড়া বেশ জানো যে তোমার সঙ্গে দরদস্তুর করতে পারবো না, সেটাতে আমার এবং অন্য রিক্সাওয়ালাদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়েছে।...আর সবচেয়ে যেটা unfair সেটা হচ্ছে তোমার এই ন্যাকামী, তুমি রীতিমত লেখাপড়া শিখেছ, স্বচ্ছন্দে অন্য কাজ করতে পারতে, বেচারী গরীব

রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে ভীড় বাড়াতে আসার কী দরকার ছিল? এতে ওদের খানিকটা অন্ন ত মারা যাচ্ছে!"

কমল যেন এবার একটু দমে গেল। বললে, "তোমার শেষ অভিযোগটার জবাব পরে দেবো, তবে তোমার প্রথমদিককার কথাগুলোয় যুক্তি আছে মানতেই হবে। বেশ, তুমি অন্য রিক্সায় যাও, আমি ডেকে দিচ্ছি!"

আমি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলুম, "আমি এখান থেকে নড়ছি না।"

কমল আরও বিব্রত হয়ে বললো, "তাহ'লে আমি কিন্তু ভাড়া নেবোনা তা বলে দিচ্ছি—"

"তাই বা আমি শুন্‌ব কেন! তবে যতটা কম পারি তা নিশ্চয়ই দেবো।"

আর কোন কথা না ব'লে সে আবার সাইকেলে চড়ে বসে বললে, "কোথায় যাবে?"

এবার আমার পালা। বেশ প্রশান্ত কণ্ঠেই জবাব দিলুম, "ভেবেছিলুম পাঁড়ের ধর্ম্মশালায় যাবো। তার আর দরকার নেই, তোমার বাসাতেই উঠ্‌ব—"

"আমার বাসাতে? Impossible!"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, "কেন?"

"সে আমার বলতে গেলে ভিখারীর বাসা, সাধারণ রিক্সাওয়ালার সংসারে যা আছে, আমার তাও নেই। সেখানে তুমি থাকতে পারবে কেন?"

"বেশত, দেখতে দোষ কি? না থাকতে পারি অন্যত্র চলে যাবো।"

"না, না, সে হয় না। সে যে কত দীন সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই!"

বেশ খানিকটা বিদ্রূপের সঙ্গেই জবাব দিলুম, "তুমি ত আমাদের মত মধ্যবিত্তদের চ্যালেঞ্জ ক'রেই এ দৈন্য বরণ ক'রে নিয়েছ, তবে তোমার এত লজ্জা কেন? এ লজ্জা বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেয়—"

কমলের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে জবাব দিলে, "অন্ততঃ মধ্যবিত্ততা আর একটু কম থাক্‌লে বুঝতে পারতে যে এ আমার লজ্জা নয়, তোমাদের কেরাণী মনোবৃত্তিকে ওটা তিরস্কার!...যাক্‌, চলো—"

অনেক ঘুরে সোনারপুরার একটা রাস্তা দিয়ে সে বাঙ্গালীটোলার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর একটা দুধওয়ালার দোকানের সামনে রিক্সা দাঁড় করিয়ে আমার বিছানা আর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললে, "এইখানেই নাবতে হবে, আমার গলিতে গাড়ী যায় না।"

ব্যাগটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চলতে চলতে বললুম, "বেশ চলো। মোদ্দা তোমাকে দিয়ে মাল বওয়াবো, এমন ত কথা ছিল না!"

কমল জবাব দিলে না। তবে তার মুখ দেখে বুঝলুম যে আমার এই আক্রমণে সে বিব্রত এবং বিরক্ত।

কাশীর সঙ্কীর্ণ গলি ক্রমে সঙ্কীর্ণতর হয়ে এলো; তারই একটার মধ্যে ঢুকে খানিকটা চলবার পর সে থম্‌কে দাঁড়ালো। সেখানটায় গলি এতই সরু হয়েছে যে দুটো বাড়ীর কার্ণিস্ পরস্পরে ঠেকে সামান্য আকাশও আর দেখা যায় না। সমস্ত পথটা অন্ধকার এবং দুর্গন্ধে পূর্ণ।

যে ভাঙ্গা বাড়ীটার সামনে আমরা দাঁড়ালুম, সেটা তিনতলা। এতই পুরোনো যে দেখে মনে হয় শেরসাহের আমলেও এমনি ছিল, হয়ত বা হরিশ্চন্দ্রও এ বাড়ীতে রাত কাটিয়ে গেছেন। কমল একবার আমার দিকে একটু বিরক্ত, একটু যেন উদ্ধত দৃষ্টি হেনে সোজা দোর ঠেলে ভেতরে ঢুক্‌ল। দোর খোলাই ছিল, বোধ হয় বন্ধ করাও যায় না। ভেতরে একটা অন্ধকার উঠোন এবং ততোধিক অন্ধকার একসার ঘর। উঠোনটাতে কতকাল থেকে আবর্জ্জনা জমেছে তা অনুমান করা শক্ত, সেগুলো পচে তা থেকে নানারকমের গাছ বেরিয়েছে; এত দুর্গন্ধ যে প্রথম নিঃশ্বাসেই যেন দম বন্ধ হয়ে এল। নিচে জনপ্রাণী ছিল না, একটা ভাঙ্গা কল থেকে অনবরত জল পড়েই চলেছে। প্রকাণ্ড সোনা ব্যাং একটা উঠোনের মাঝখানে বসে ছিল, আমাদের দেখে লাফাতে লাফাতে বোধ করি পাইখানার দিকে চলে গেল। সে-ই একমাত্র প্রাণী, যে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল।

কমলের এদিকে দৃষ্টি ছিল না। সে সটান্ উঠোন পেরিয়ে দোতালার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরেও তিনদিকে প্রায় খান-পাঁচেক ঘর,

ধুলোয় ও আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন। তারই মধ্যে একটা একটু পরিষ্কার করা, সেটাতে আলো বাতাসও কিছু আছে—সেইটেতেই কমল আমার বিছানা নিয়ে ঢুক্‌ল; একটু যেন অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে, "এই আমার ডোমেন্—"

রাজত্বই বটে। জানলার ধারে একটা মাদুর পাতা—তাতে বালিশের বদলে ইঁট। একটা দড়ীর আলনায় একটা ছেঁড়া গেঞ্জি এবং একটা অত্যন্ত ময়লা কাপড়, আর সেই ঘরেরই আর একপাশে একটা উনুন, কতকগুলো ঘুঁটে ও গোটা-দুই কালিপড়া হাঁড়ি। বোঝা গেল এইখানেই সে রান্নাবান্না করে।

ঝোঁকের মাথায় এসেছিলুম, এতটা কল্পনাও করি নি। আমার সব উৎসাহ চলে গিয়েছিল। এখানে থাক্‌ব কি ক'রে?···সে কিন্তু ততক্ষণে তার মাদুর সরিয়ে সেইখানে আমার বিছানাটা খুলতে শুরু ক'রে দিয়েছে। বললে, "বিছানাতেই বোস্, ও মাদুরে বসতে বোধহয় প্রবৃত্তি হবে না—"

আমি শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, "বাড়ীতে আর কেউ নেই?"

"পাগল! এ বাড়ীতে কে থাক্‌বে? সেই জন্যেই ত আমি দখল করেছি।"

আর কি বল্‌ব! খানিকটা পরে প্রশ্ন করলুম, "এই ঘরেই বুঝি রান্না করো? বাড়ীও'লা কিছু বলে না?"

সে মুচ্‌কী হেসে বলেল, "বললে ত ভাল হ'তো, তবু বাড়ীও'লাটা যে কে বুঝতে পারতুম!"

"তার মানে? বাড়ীও'লাকে চেনো না নাকি?"

"রামো!···দেখলুম এই বাড়ীটা এম্‌নি ভাবেই পড়ে থাকে। এতে ভাড়াটে আসবার আশা নেই, সে চেষ্টাও কেউ তাই করে না।···একদিন দোর ঠেলে এসে ঢুকে পড়লুম। ব্যস্, সেই থেকে জমিদার বনে বসে আছি।

বিছানায় বসে পড়ে ওর হাত ধরে জোর ক'রে ওকে পাশে বসালুম। বললুম, "কিন্তু এর কী দরকার ছিল তোর কমল? এতে কার কি উপকার হবে?"

কমল ম্লান হেসে জবাব দিলে, "উপকার? না, সে আশা আর করি না। এককালে সে সব স্বপ্ন ছিল বটে।"

"তবে? তবে এ কৃচ্ছ্রসাধন কেন?"

"কৃচ্ছ্রসাধন আর কি, খেতে ত হবে!"

"ও, তুমি এই রিক্সা চালানো ছাড়া আর অন্ন-সংস্থান করতে পারো না বুঝি?"

"না, তা নয়। তবে এটুকু পথও ত কত লোকের খোলা নেই! আমাদের দেশে এম্‌নি দরিদ্রের দলই-ত বেশী, এর চেয়েও দরিদ্র। এটুকু আচ্ছাদন, এটুকু খাদ্যও কত লোকের জোটে না। তারা যদি বাঁচতে পারে ত আমি পারব না?"

অসহিষ্ণু ভাবে বললুম, "কিন্তু তার দরকার কি? এতে ক'রে কি তাদের দুঃখ ঘুচ্‌বে?"

কমল এবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বললে, "ছেলেবেলায় একদিন শখ্‌ ক'রে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, আমার দেশের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনদের জীবনযাত্রার স্বাদ নেবো ব'লে, অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করব ব'লে। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা যে এই—তা স্বপ্নেও ভাবি নি। এখন আর এর চেয়ে ভাল অবস্থায় ফিরে যেতে পারি না, লজ্জা করে। সব জেনেশুনে সুখের মধ্যে কেমন ক'রে ফিরে যাবো—বল দেখি—"

বাধা দিয়ে বললুম, "কিন্তু তুই যে গোড়াতেই ভুল করলি কমল, তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ত তুই কোনদিনই পাবি না। তারা ত সরকারী চাকুরের ছেলে নয়, বি-এ পাশও করে নি। তোর যে অবস্থায় কষ্ট হবে তাদের তাতে হয় না।"

"ওসব তোমাদের চালাকী!"···সে বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই ব'লে উঠল, "কষ্ট সকলকারই হয়, তোমরা শুধু ঐসব ব'লে মনকে প্রবোধ দাও। আর তা ছাড়া আমি অনেকদিনের সাধনায় ওদের স্তরেই নেমে এসেছি। আমি যে ইংরেজী শিখেছিলুম, তা আজ প্রায় বছর-দুই পরে মনে পড়ল।"

তারপর কতকটা খাপছাড়া ভাবেই বললে, "আজকাল বিড়ি খাওয়া ধরেছি ···আছে তোর কাছে?"

"না, সিগারেট আছে, দিতে পারি।"

"থাক্—ওতে আমার নেশা হয় না।…"

খানিকটা দুজনেই চুপচাপ। একটু পরে কমল হঠাৎ উঠে পড়ে বললে, "তাহ'লে তুই বোস, আমি তোর খাওয়া-দাওয়ার জোগাড় করি। ঘরে কিছুই নেই, প্রায়ই রাঁধি না, অন্য রিক্সাও'লার আড্ডায় কাজ সারি। যেদিন তাও জোটে না, ছত্তর আছে।…অবশ্যি তার জন্যে ভাবনা নেই, দোকান বাজার সব আছে, এক মিনিটেই পাওয়া যাবে।"

সে একটা গামছা টেনে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। অগত্যা মরীয়া হয়েই কথাটা ব'লে ফেললুম, "ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই ভাই, সত্যি কথাটা বলতে কি, এখানে আমি থাকতে পারবো না।"

মুহূর্ত্তের জন্য মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর। তারপরই কিন্তু যেন আশ্চর্য্য চেষ্টায় নিজেকে সাম্‌লে নিলে, হা হা করে হেসে উঠে বললে, "এ ত আগেই বলেছিলুম তোকে যে, সে impossible! যাক্—এতক্ষণ পরে তোর sense ফিরে এসেছে, এই রক্ষে।"

সে একেবারে এসে আমার বিছানাটায় টান্ দিয়ে বললে, "নে ওঠ্, এটা বেঁধে ফেলি। এখনও ধরমশালায় গেলে কলে জল পাবি, এরপর চান করার অসুবিধে হবে—"

বুঝলুম যে ওর ব্যথা লাগল, তবু শেষ পর্য্যন্ত উঠেই দাঁড়ালুম। যা পারব না, তাকে স্বীকার ক'রে লাভ নেই। বিছানা বাঁধা হ'লে সে নিজেই ব্যাগটা সুদ্ধ তুলে নিয়ে বললে, "চল্ তাড়াতাড়ি—"

আবার সেই উঠান এবং সঙ্কীর্ণ গলি। বড় রাস্তায় পড়ে যেন দম নিয়ে বাঁচলুম। ওরই রিক্সায় চড়ে বসেছি, অন্য রিক্সার প্রস্তাব করেছিলুম, বিদ্রূপ ক'রে বললে, "কেন ভাড়াটা কি আমাকে দিতে কষ্ট হবে?"

ধর্ম্মশালায় পোঁছে ও-ই একটা ছোট ঘর ব্যবস্থা ক'রে দিলে। নিজেই দোর খুলিয়ে, ঘর ঝাঁট দিয়ে চৌকীতে বিছানা পেতে ঠিক ক'রে দিয়ে বললে, "বাবু এবার আমার পয়সাটা?"

আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। অথচ বাধা দিতে গেলেও একটা নাটকীয় ব্যাপারের অবতারণা করতে হয়—এবার কোনমতে মরীয়া হয়ে বললুম, "পয়সা আমি তোমাকে হাতে তুলে দিতে পারব না।"

সে দৃঢ়স্বরে বললে "না দিতেই হবে। আমার সারা সকলটাই ত আজ গেল বলতে গেলে। আমাকেও তো রিক্সার ভাড়া দিতে হবে মালিককে, কোথা থেকে দেবো?"

অগত্যা ব্যাগটা ফেলে দিয়ে বললুম, "ওর মধ্যে থেকে বার ক'রে নাও, যা তোমার ভাড়া—"

ব্যাগ খুলে একটা সিকি নিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, হাতটা ধরে ফেলে বললুম, "আর কি দেখা হবে না কমল?"

সত্যিই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এতদিন ভুলে ছিলুম কিন্তু আজ এই অবস্থায় ওকে দেখে বাল্যের সমস্ত স্নেহ যেন তার প্রতিশোধ নিচ্ছিল। কমল, অদ্ভূত এরকম ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "দেখা করতে এলে লজ্জা পাবি না ত?"

আমি এবার ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরলুম, "বললুম, কেন অমন করছিস ভাই! আমার মনের মধ্যে যে কী হচ্ছে তা কি বুঝতে পারছিস্ না?···ঐভাবে থাকার কথা কখনো ভাবতে পর্য্যন্ত পারি নি তাই চলে আসতে হ'লো, কিন্তু আমি কি আর কোন—"

নিমেষে সে অনুতপ্ত হয়ে উঠ্‌ল! চোখ উঠ্‌ল ওর ছলছলিয়ে। সেও আমাকে বুকে চেপে ধরে বললে, "তুই তেমনিই ছেলেমানুষ আছিস। সুধা!··· আচ্ছা, আস্‌ব'খন কাল পরশু—"

আমি ইচ্ছে ক'রেই ওকে বাড়ী ফেরার কথা বললুম না। যদি গা-ঢাকা দেয় এই ভয়ে। কিন্তু সে আর এলো না। পরের দিন বিকেলে বেড়িয়ে এসে দেখি ম্যানেজারের ঘরে এক ঠোঙ্গা খাবার নানা রকমের—আর তার সঙ্গে একখানা চিঠি।

চিঠিতে লেখা ছিল--

"দেখা না করাই ভাল, বুঝলি! তুই মিছিমিছি ব্যথা পাবি। তা ছাড়া ফেরাবার চেষ্টা করবি, অথচ ফিরতে আমি পারব না। দিন-দশেকের জন্যে দেহাতে যাচ্ছি, খুঁজতে চেষ্টা করিস না।"

খুঁজতে চেষ্টা করেছিলুম তবুও, কিন্তু কোন খবরই কেউ বলতে পারলে না! একবার মাত্র দেখা দিয়ে আবার বুদ্‌বুদের মতই সে অনন্ত জনসমুদ্রে মিশিয়ে গেল।

একবারে দু'বৎসর পরে আবার দেখা। ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, অন্য পথের একখানা বাস থেকে সাহেবী পোশাক-পরা দীর্ঘাকৃতি একটি ভদ্রলোক নেমেই সোজা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। চমকে চেয়ে দেখি কমল!

"এ কী ব্যাপার রে?"

"চল্ না, বলছি।"

ডালহাউসি স্কোয়ারেরই একটা বেঞ্চিতে বসে সে তার ইতিহাস বিবৃত করলে। রীতিমত রোমান্‌স্ একেবারে।

সে যা বললে তার সারমর্ম্ম এই—

কাশীতেই রিক্সা চালাবার সময় ওর বৌ অনিলার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ওর। সুন্দরী মেয়ে, ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে পড়ছে, কলেজেরই এক অধ্যাপিকার সঙ্গে কাশীতে বেড়াতে এসেছিল। কমলের রিক্সা চড়ে যাবার সময় কেমন ক'রে তার সন্দেহ হয় যে কমলের এটা ছদ্মবেশ, এবং সে শিক্ষিত। টেররিজ্‌ম্-এর ফল আশঙ্কা ক'রে মনের মধ্যে অনিলা একটা উপন্যাস রচনা ক'রে এবং প্রাত্যহিক একটা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে কমলেরই রিক্সায় চড়ে অকারণে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। কমল বললে, "কী ক'রে যে আমাকে ফাঁদে ফেলে আমার সব ইতিহাস জেনে নিলে এবং তারপর যে কেমন ক'রে একদিন আমাকে সংসারী করলে তা আমিই জানি না। ওর ঠিক অভিভাবক বলতে যা বোঝায় সে রকম কেউ ছিল না

ব'লেই এতটা স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক্—সমস্ত ব্যাপারের 'সাম-টোটাল' হচ্ছে এই যে, আমি তাকে বিবাহ করেছি এবং তারই এক আত্মীয়ের চেষ্টায়, একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করছি। আশী টাকা বেতন, থাকি স্ত্রীরই পৈতৃক বাড়ীর একটা ফ্ল্যাটে, হাজরা রোডে।"

আমি বললুম, "তা আমাকে এতদিন খবর দিস্ নি কেন ?"

কমলের মুখ লাল হয়ে উঠ্ল, "বললে, কী জানিস্, আমার বড় লজ্জা করে। মনে হয় এটাই আমার ছদ্মবেশ, আমার আসল পরিচয় ছিল ঐটে—"

তারপর সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল খানিকটা। জিজ্ঞাসা করলুম, "বাড়ীতে জানে ?"

"না, ইচ্ছে করেই জানাই নি। বেশী বন্ধন আমার সহ্য হবে না। ঐ জন্যেই বন্ধুবান্ধবদেরও সঙ্গে দেখা করি নি। আমার প্রকৃতিটাই যেন নিঃসঙ্গ। শিক্ষিত লোক, যাদের সঙ্গে মেশা যায়, তাদের সঙ্গ আমার সহ্য হয় না। এর চেয়ে মুটে, রিক্সাওয়ালাই ভাল, তাদের সঙ্গের দায়িত্ব নেই, ভেবেচিন্তে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলতে হয় না। যে কোন সময়ে তাদের ত্যাগ করা চলে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম "সে সব লেক্‌চার তোমার পরে হবে, এখন চলো তোমার বাড়ীতে যাই। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে আসি—"

"চলো।"

ব'লে সে উঠ্ল। উৎসাহ নেই, আপত্তিও নেই—এই রকম তার ভাব। তবু তাকে টেনে নিয়ে গেলুম। অনিলার সঙ্গে আলাপও হলো। বেশ মানুষ—আলাপে-আব্‌দারে, হাস্যে-পরিহাসে চঞ্চল, উচ্ছল মেয়েটি। দেখতেও ভাল—যাকে বলে bright girl—তাই!

দ্রুত আলাপ জমে উঠ্ল। বিবাগী মন কিসের আকর্ষণে গৃহী হয়েছে বুঝলুম। এর পর একদিন আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেলুম, অনিলাও এল আমাদের বাড়ীতে। হারিয়ে যাওয়া সখ্যের আবার সেতুবন্ধন হলো। মনে হলো এমনিভাবেই দিন যাবে।

কমল এই সব সামাজিক হৃদ্যতা পছন্দ না করলেও মেনে নিয়েছিল। আমার

স্ত্রীকে ঠিক ওর ভাল লাগত না, কিন্তু ছেলেমেয়েদের ভালবাসত। বাড়ীতে এলে তাদের নিয়েই হল্লা করত। এইভাবেই বছরখানেক কেটে গেল। গত জুলাই মাসে একদিন সন্ধ্যার সময় কেমন যেন উদভ্রান্ত ভাবে এসে হাজির হলো কমল। বললে, "চল্ একটু বেড়িয়ে আসি।"

চুলগুলো উস্‌কো-খুস্‌কো, মুখখানা ম্লান। ব্যস্ত হয়ে বললুম, "কী ব্যাপার রে?"

এর মধ্যে মাস-দুই নানা কারণে ওদের খবর নিতে পারি নি, ভাবলুম হয়ত কোন বিপদ আপদই ঘটেছে।

সে কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, "কৈ, কিছু না ত!"

"তবে, এমন বেশভূষা কেন?"

"ও, এমনিই।"

নীরবে অনেকখানি হাঁটবার পর একটা পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসলুম। সেখানেও সে খানিকটা চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠ্‌ল, "সুধা, আর ভাল লাগছে না ভাই।"

"সে কি? তার মানে?"

"প্রতিদিন এই একই নিয়মে চলা, বাজার করা, খাওয়া, অপিস যাওয়া আবার ফিরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে ঘরকন্নার গল্প, এ যেন অসহ্য বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু তোমার সে জীবনেও কি নিয়মিত কাজ করতে হ'তো না?"

অসহিষ্ণু ভাবে বললে সে, "বুঝতে পারছিস না, সে যে একা, তার কোন দায়িত্ব নেই যে—"

সে কথা আর না তুলে বললুম, "তা বই-টই পড়িস্ না কেন একটু, মন ভাল থাকে ওতে। সিনেমা-টিনেমা—"

"ও সব ভাল লাগে না। সিনেমাতেও বড্ড ভীড়—"

কী আর বলব। চুপ ক'রেই রইলুম। খানিকটা পরে সে আবার হঠাৎ উঠে পড়ে বললে, "চললুম।"

"কোথায় রে ?" শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম।

"ভয় নেই, বাড়ীই যাচ্ছি।"

একটু হেসে সে চলে গেল।

দিন-তিনেক পরে অনিলার কাছ থেকে একছত্র চিঠি পেলুম, "একবার আসবেন ?"

অপিসের ফেরৎ চলে গেলুম। অনিলা একাই চুপ ক'রে বসেছিল। মুখে ওর কেমন একটা শান্ত করুণ ভাব।

"ব্যাপার কি ?"

অনিলা বাক্স খুলে একখানা চিঠি বার ক'রে দিলে। কমলের লেখা—

"অনিলা, আর পারছি না। তোমার যা নিজের সম্পত্তি আছে তাতেই তোমার চলে যাবে। সেদিক দিয়ে ভাববার কিছু নেই।

আর যখন যা দরকার পড়বে, সুধাকে বোলো, সে ক'রে দেবে এখন।

আমাকে গৃহী করতে গিয়ে এ risk তুমি আগেই নিয়েছিলে, এখন আমাকে দোষ দিও না। এ আমার দ্বারা আর সম্ভব নয়। কমল।"

চিঠি শেষ ক'রে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম খানিকটা। শেষে বললুম, "সে যে এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হ'তে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।"

অনিলা বললে, "কিন্তু দায়িত্ব ত তিনি নেন নি, আমিই নিয়েছিলুম।"

"তা বটে।"

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললুম, "এখন কি করবে ?"

"অপেক্ষা করব। শান্ত কণ্ঠে অনিলা জবাব দিলে, "কিন্তু তাঁকে আসতেই হবে একদিন। গৃহের স্বাদ তিনি পেয়েছেন, বাইরের জীবনও তাঁর ভাল লাগবে না, ফিরে আসবেন একদিন। তার আগে তাঁকে খুঁজেও লাভ নেই। ·· আর, এবার এলে আর তাঁকে যেতে হবে না, তাও জানি।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, "কেন ?"

সে লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করলে।

বুঝলাম বৃহত্তর আকর্ষণ আছে তারই মধ্যে, প্রকাশের অপেক্ষায়।

'তেরশো পঞ্চাশ'

পারুলের ঘোম্‌টা দেওয়া যেন একটা রোগ। স্বামীর সামনে অন্য কেহ থাকিলে ত ঘোম্‌টা দিতই, এমন কি স্বামীর সহিত নিভৃতেও মাথার কাপড় খুলিয়া আলাপ করিত না। তাছাড়া উপরে-নীচে যত ঘর ভাড়াটে আছে প্রত্যেকটি পরিবারের গৃহিণীকেও শাশুড়ীর মত সমীহ করিয়া চলিত। আর পুরুষমানুষ যেমনই হউক—পাঁচ বছরের ছেলেকে দেখিলেও, একগলা ঘোম্‌টা সে দিবেই। নিতান্ত সমবয়সী বধূ বা কুমারী কন্যাদের সাম্‌নে সে ঘোমটাটা কিছু খাটো করিত, তাও—একেবারে মাথার কাপড় খুলিতে কেহ তাহাকে দেখে নাই।

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিত, "আমাকে আজই তোমরা এমন দেখছ ভাই, কত বড় বংশের মেয়ে আমি সেটা যদি জান্‌তে তাহ'লে আর একথা তুলতে না। চিরদিন ত আর এমন ছিল না। আমাদের বাড়ীতে ছেলেবেলায় দেখেছি মদ্দা মাছি পর্য্যন্ত অন্দর মহলে ঢুক্‌তে পেত না। কত বড় আবরু, আর ইজ্জৎটাই কি সাধারণ! ঠাকুর দাদার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত।"

শুধু ঘোমটা নয়—লজ্জাটাও ছিল তাহার বাড়াবাড়ি রকমের। একে ত অত বড় বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার ঘরটায় থাকিত তাহারা, তাহার উপর একমাত্র যে জানালা রাস্তার দিকে ছিল, যাহার মধ্য দিয়া আলো আসিতে পারিত, সেটাও সে সারাদিন রাখিত বন্ধ করিয়া—যদি রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে কেহ দেখিতে পায়! একেবারে সেই রাত্রিবেলা, শয়নের পূর্ব্বে, আলো নিভাইয়া তবে সে জানালা খুলিত। দোতালার কোণের ঘরের মেজবৌ স্বাস্থ্যহীনতার দোহাই দিলে বলিত, "কি করব ভাই, একতলার ঘরে ত থাকার অভ্যাস নেই কোনকালে—ও আমার কেমন বাধো-বাধো

লাগে। মনে হয় দুনিয়াসুদ্ধ লোকের চোখের সাম্‌নে বাস করছি যেন। ঘরে আমি যেমনই থাকি, বাইরের লোক দেখলে বড় লজ্জা।"

কিন্তু এত লজ্জা বুঝি পারুলের আর থাকে না!

তাহার স্বামী হরিপদ লেখাপড়া বিশেষ শেখে নাই সুতরাং অফিসে তাহাকে ছোট কাজই করিতে হইত। মাহিনা, এই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরেও তাই, পঁয়তাল্লিশে ঠেকিয়া আছে। ঐ টাকা হইতেই চারি পাঁচটি প্রাণীর খাওয়া, পরা, ঘরভাড়া, লৌকিকতা মায় ডাক্তার খরচা পর্য্যন্ত চালাইতে হইত। অবশ্য এতদিন একরকম করিয়া চলিয়াও গিয়াছে। গৃহস্বামীর এই ঘরটি আগে কোনদিনই ভাড়া হইত না, এত অন্ধকার এবং অস্বাস্থ্যকর ছিল ঘরটা—সুতরাং তিনি অনুগ্রহ করিয়া ছয় টাকাতেই, সামনের চটের পর্দ্দা দেওয়া রান্নার জায়গাটুকু সুদ্ধ ভাড়া দিয়াছেন। ঘরভাড়াটা কম হওয়াতে এতদিন কোনমতে বাকী টাকায় সংসার চলিয়াছিল কিন্তু এখন আর চলে না। অফিস হইতে মাগ্‌গি ভাতা হিসাবে ন'টি টাকা এবং মাসে পনেরো সের চাল পাওয়া যায় বটে, তবে সে আর কতটুকু। আরও এক মণ চাল হইলে তবে তাহাদের সংসার চলে, অথচ তাহারই দাম প্রায় চল্লিশ টাকা।

অফিসের সব টাকাটাও হাতে আসে না। জিনিসপত্রের দাম বহুদিন হইতেই চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সে ঘাট্‌তি পূরণের জন্য অফিসের কো-অপারেটিভ সোসাইটি হইতে ধার করা ছাড়া উপায় ছিল না। সে ঋণ পঞ্চাশ হইতে আশি, আশি হইতে দেড়শ' ক্রমে আড়াইশ' টাকায় পৌঁছিয়াছে। সেখানে আর ধার পাওয়া সম্ভব নয়, অথচ মাহিনা ও মাগ্‌গি ভাতা মিলাইয়া মাত্র একচল্লিশটি টাকা মোট তাহার হস্তগত হয়, বাকী যায় দেনা শুধিতে।

পারুল বহুদিনই একবেলা খাওয়া ধরিয়াছে। হরিপদও রাত্রে বসে নাম মাত্র কিন্তু ছেলেদের ফ্যানে-ভাতে মিশাইয়াই হউক আর যে ভাবেই হউক—দুই বেলা দিতে ত হইবে। কয়লার মণ কখনও দেড় টাকা কখনও আড়াই টাকা কখনও বা আরও বেশী। গুঁড়া কিনিয়া পারুল গুল দিতে রাজী আছে কিন্তু রৌদ্র পাওয়া যায় না, ছাদে দিলে রৌদ্র যদিবা মেলে, গুলগুলা

অক্ষত অবস্থায় মেলে না। তেতালার ভাড়াটের ছেলেমেয়েরা সারাদিন ছাদে দাপাদাপি করে, ফলে গুলগুলা গুঁড়াইয়া মাড়াইয়া কাজ আরও বাড়াইয়া তোলে। কোনমতে অল্প অল্প করিয়া ঝুড়িতে দিয়া সেই ঝুড়ি গরম উনানে বসাইয়া তাহাকে গুল শুকাইতে হয়—তাহাতে অতিকষ্টে একবেলা রান্নাটা চলে। কিন্তু রাঁধিবেই বা কি ছাই ভস্ম—চাল, ডাল, আটা কিছুই নাই!

ছেলেমেয়েগুলা একটু বড় হইলেও না হয় কণ্ট্রোলে পাঠানো চলিত। দৈনিক এক সের চাল ঘরে আসিলেও অনেকটা সাশ্রয় হয়। উপর-নীচের সব ভাড়াটেরাই ছেলেদের কণ্ট্রোলে পাঠায়—চাল, আটা, চিনি কিছুরই অভাব নাই! কিন্তু তাহার বড় ছেলেটা মাত্র পাঁচ বছরের—ঐটুকু ছেলেকে কণ্ট্রোলের কিউতে দাঁড় করানো যায় না, তাহা ছাড়া আর কেহ তাহার ভারও নিতে চায় না। বাকীগুলি ত আরও অপোগণ্ড, তাহাদের দুগ্ধ-পোষ্য বলাই উচিত, যদিও দুধ আর তাহাদের কাহারও মেলে না।

তা না মিলুক—চালটা মিলিলেও চলিত। ছোটটিকে ফ্যান খাওয়াইয়া রাখে, কিন্তু বড়গুলি বড় চ্যাঁচামেচি করে। জল খাবারের বালাই ত নাই-ই—রাত্রে দুটি না দিলে কিছুতে শোনে না। হরিপদ এদিক ওদিক হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া মধ্যে মধ্যে কিছু আটা সংগ্রহ করে, পারুলও এক একদিন উপরতলায় মেজবৌকে ধরিয়া তাঁহার ছেলেদের দিয়া চাল বা চিনি কিছু কিছু আনায় কিন্তু সে আর কতটুকু? দুই একদিন চলে, তারপর যে সেই। সন্ধ্যা হইতে যতক্ষণ না ঘুম আসে, চিলের মত চ্যাঁচায়। দুই-এক মুঠা রাত্রের জন্য পারুল যেমন করিয়া হোক ফেলিয়া রাখে কিন্তু তাহাতে তাহাদের ক্ষুধা এবং ক্রোধ দুই-ই যেন বাড়িয়া যায়—আরও চেঁচায়।

তেতালার ঘোষালগিন্নী বলেন, "হ্যাঁগা বৌমা, তোমার ছেলেদের কি বাছা তুমি বসে বসে চিমটি কাটো! ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, এমন কাঁদুনে ছেলে-মেয়ে বাপের বয়সে দেখি নি। আর ত সহ্য হয় না।"

পারুল ঘোমটার মধ্য হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে, "শরীরটা মা ওদের

মোটে ভালো যাচ্ছে না ক'দিন থেকে। এরকম ঘরে ত থাকা ওদের অভ্যেস নেই, শরীর মোটে টিকৃছে না।"

ঝঙ্কার দিয়া ঘোষাল গিন্নী বলেন, "নবাব পুত্তুরদের নিয়ে ভাল ঘরে উঠে গেলেই ত পারো বাছা, আমাদের হাড় জুড়োয়।"

তারপর যেন কতকটা স্বগতোক্তি করেন, "মাইনে ত কি পান্ তা বুঝতেই পারি। এর চেয়ে ভাল ঘরের অভ্যেসটা যে হ'ল কি দিয়ে তা ত জানি না।···উঠে আর তুমি যাবে না বাছা, উঠতে একদিন আমাদেরই হবে।"

হরিপদরও আর সহ্য হয় না। অফিসের খাটুনির পর বাড়ী আসিয়া লোকে একটু বিশ্রামই চায়, অন্তত একটু শান্তি। সে এক একদিন চীৎকার করিয়া উঠে, "দাও না গলাগুলো টিপে। আপদের শান্তি হোক্।"

পারুল জবাব দেয়, "হ্যাঁ তা দেবে বৈকি। ওদের বড় দোষ না? ওদের সংসারে এনেছিল কে? ওরা কি আপনি আসতে গিয়েছিল? খেতে দিলেই ত ওরা চুপ করে।"

হরিপদ রাগ করিয়া বাহিরে গিয়া বসে। চেঁচাক উহারা যত পারে।

কিন্তু কষ্টও হয়। একদিন হরিপদ বলিল, "ওরা ত সব দেখি ভিখিরীদের ডেকে ডেকে ফ্যান দেন। ফ্যানগুলো চেয়ে রাখতে পারো না? এক এক বাটি খাইয়ে দিলে বোধ হয় চুপ করে।"

পারুল ঘোমটার মধ্য হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠে, "আমি [illegible] পারব না। চাইতে হয় তুমি চেয়ো। ভিখিরীর সঙ্গে আমার ছেলে[illegible] সমান করবার আগে গলায় দড়ি দেবো—"

মুখে অস্বীকার করিলেও কথাটা প্রাণে লাগে। তাছাড়া, ছেলেদের কান্নাও অসহ্য বোধ হয়। শেষ পর্য্যন্ত কথাটা তাহাকে বলিতেই হইল। মুখুয্যেদের মেজবৌকে ডাকিয়া একদিন সে বেশ গুছাইয়া বলিল, "মেজদি একটা কথা বলব ভাই, কাউকে যদি না বলো।"

"কি কথা গা, পারুল বৌ?"

"ছেলেটা ভাই বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছে, এই ওদের বাড়ের মুখ কি না—

দুধ-টুধ ত আর পায় না—যা পায় দুবেলা দুমুঠো। তাই কর্তা বলছিলেন একটু ক'রে ওদের ফ্যান খাওয়াতে। আমার ত ফ্যানে-ভাতে হয়, ফ্যান গালি না—যদি তুমি ভাই একটু করে ফ্যান ঢেলে রাখো ছেলেটার জন্যে—"

মেজবৌ মুচকী হাসিয়া কহিল, "দিতে ত পারতুম ভাই কিন্তু দক্ষিণের ঘরের মালতীদের মোটে খাওয়াই হয় না, অর্দ্ধেকদিন দুবেলা উপোস চলে ওদের। তাই শাশুড়ী বলেছেন ওদেরই ফ্যানটা দিতে। তা তুমি যদি বল ত না হয়, সনাতন বাবুর বৌকে বলে দেখতে পারি। ওদের বড় সংসার বেশী চাল ফোটে—।"

পারুলের কানের পাশটা অকারণেই গরম হইয়া ওঠে, তবু সে মাটির দিকে চাহিয়া বলে, "ত্যাখো ভাই যা ভাল বোঝো তাই করো।"

পারুল সিঁড়ির কাছটাতেই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মেজবৌ আর সনাতন বাবুর স্ত্রীর কথাবার্ত্তা সেখান হইতেই কানে পৌঁছায়। সনাতন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তা দিতে অবিশ্যি পারি। সে কি কথা, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে খাবে তার ওপর ত কথা নেই। তবে ভাই ভিখিরীগুলো কি করে এসে শুনেছ ত? প্রাণের মধ্যে কেমন করে যেন—একদিন একদিন না দিলে চলবে না।"

মেজবৌ নামিয়া আসিয়া বলে, "কথা ঠিক করে এলাম পারুল বৌ, দু-একদিন যদি এদিক ওদিক হয়—নইলে রোজই পাবে। আমি দিতে পারতুম, কিন্তু মালতীরা আবার বামুন, সনাতন বাবুদের ফ্যান ওদের ত চলবে না। কিছু মনে করো না যেন।"

ইহার পর হইতে ফ্যান সে ঘটিতে ভরিয়া কা...ড়ের মধ্য করিয়া রোজই লইয়া আসে—প্রকাশ্যে আনিতে না কি তার বড় লজ্জা করে। যদিচ কথাটা জানিতে প্রায় কাহারও বাকী নাই।

ঘোষাল গিন্নী বলেন, "ছুঁড়ী ভাঙ্গবে তবু মচ্‌কাবে না। শুধু শুধু কাপড়টা সকৃড়ী করা—"

একঘটি ফ্যান অনেকটা। সন্ধ্যাটায় ছেলেমেয়েগুলা তবু শান্ত থাকে। তারপর ত ঘুমাইয়া পড়ে। যেদিন হরিপদর অফিস হইতে আসিতে দেরি

হয়, সেদিন পারুলও গোপনে একবাটি করিয়া খায়। ছেলেরা চেঁচামেচি করিলে তাহাদের ফ্যানে জল মিশাইয়া বাটির মাপ সমান করিয়া দেয়।

কিন্তু মুস্কিল:হয় সন্ধ্যার সময়ই, যেদিন ভিখারীর ভীড় লাগে—'ওমা মাগো, বাচ্ছাটা মরে গেল মা ক্ষিধেয়।' 'একটু ফ্যান হবে মা,' 'একমুঠো ভাত পেলে জীবনটা বাঁচে মা'—ইত্যাদি।

কানে গেলেই আজকাল পারুল গজরায়. "মুখে আগুন, মর্ মর্ সব। আমার ফ্যানটুকুতে ভাগ না বসালে চলে না বেটাবেটিদের। মর না রাস্তায় পড়ে—কি হবে তোদের বেঁচে!"

এইভাবে তবু একরকম করিয়া চলিতেছিল। সহসা হরিপদ পড়িল অসুখে। কঠিন রকমের ম্যালেরিয়া। কোথায় বাক্সের কোন্ গহ্বরে পারুলের ভাঙ্গা একজোড়া মাকৃড়ী ও বাঁধানো শাঁকার দরুণ আঁশের মত পাতলা একটুকরো সোনার পাত পড়িয়াছিল—এযাত্রা সেইগুলি দিয়া হরিপদর ইন্‌জেকশান ও গ্ল‌ুকোজ কেনা হইল। মোড়ের ডাক্তারবাবু তবু অবস্থা দেখিয়া ফি লইলেন না। কিন্তু এধারে চলে কি করিয়া? অফিসের ছুটি মিলিলেও চাল বন্ধ। সামান্য যেটুকু চাল আসিত তাহাও আর আসে না। বাজারে বিয়াল্লিশ টাকার কম চাল নাই। নিজের যা টাকা হাতে ছিল তাহার সহিত একটা দেশী শাড়ী মেজবৌর কাছে বন্ধক রাখিয়া আরও তিন টাকা ধার করিয়া পারুল আধ মণ চাল কিনিয়াছিল, কিন্তু তাই বা ক'দি[illegible] লজ্জা ত্যাগ করিয়া সে আজকাল প্রকাশ্যেই ফ্যান খায়, তবুও বিশে[illegible]বিধা হয় না। ফ্যানের চাহিদা বেশী, অথচ সকলেই আজকাল ফ্যানটা [illegible] বসাইতে চায়, তাহাতে না কি ভাতের ওজন বাড়ে। বাড়ীতে তাহার মত অবস্থা আরও অনেকেরই আছে। মালতীদের দিকে, এমন কি পারুলও চাহিতে পারে না। একটি পরিবার সম্পূর্ণ বলিতে গেলে মুখুয্যেদের ফ্যানে প্রতিপালিত হয়।

হরিপদ একটু একটু করিয়া সারিতেছে, তাহার অন্ততঃ দুই বেলা ভাতটাও খাওয়া দরকার, নহিলে অফিসে যাইতে আরও দেরি হইবে। পারুল সবই বোঝে কিন্তু কোন মতেই কুলকিনারা পায় না। মালতীর লজ্জা

কম, মাথাও তার খুব সাফ—সে বাড়ী সুদ্ধ সমস্ত পরিবারের কুট্‌নার খোলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া নুন লঙ্কা দিয়া সিদ্ধ করিয়া খায়। তাহাতে পুষ্টি না হোক্—ছেলেমেয়েদের অন্তত সান্ত্বনা দেওয়া যায়। মালতীর স্বামী মাহিনা পায় মাত্র ত্রিশটি টাকা, দেশী অফিস—চাল ডালও পায় না। এক বছরের শিশু একটি কোলে—সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধের অভাবে সে কাঠির মত শুকাইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু মালতীর কথা ভাবিলে পারুলের চলে না। নিতান্ত প্রয়োজনের বাসন কয়টি ছাড়া সবই ইতিপূর্ব্বে গিয়াছে। বিক্রী করিবার মত শাড়ীও তাহার আর নাই। তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়ে এক এক সময়ে ছেলে-মেয়েগুলোর প্রতি, "মরতে কেন এলি আমার পেটে!...এত লোকের ছেলেমেয়েদের ওলাউঠো হয়, তোদের হয় না! মর্ মর্ সব—আপদবালাই কোথাকার!"

হরিপদ মৃদু অনুযোগ করে হয়ত, "ছিঃ পারুল অমন ক'রে বলতে নেই!"

পারুলের চোখে আসে জল, "না বলতে নেই! তোমার আর কি—আমার যে আর সহ্য হয় না। দিন রাত খাই খাই, আর চীৎকার—আমি কোথা থেকে কী পাই সেটা ত বোঝ না। ভুলিও না নিজে ছেলেমেয়েদের...তাহ'লে আর কিছু বলব না।"

তাহার পর আপন মনেই বকিয়া চলে, "একটি হেঁসেলের ঘটি ছিল, সেটা বেচেও চাল কিনলুম তবু এক বেলা গেল না—আমি কোথা থেকে কী পাবো আর! মরুক সব না খেয়েই—"

কিন্তু উপায় একটা করিতেই হয়।

মেজবৌর কাছে ইতিমধ্যে তিনটাকা ধার হইয়াছিল, সে তাগাদা দেয় "ও পারুল বৌ, শাশুড়ীকে লুকিয়ে টাকা দিয়েছি টের পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বিশেষ কাল-পরশুর মধ্যেই হয়ত তিনি কালীঘাটে যাবেন, টাকার দরকার হবে। দিয়ে দিয়ো ভাই"—

সহসা পারুলের চোখ জ্বলিয়া ওঠে। বলে, "এতই করলে মেজদি, আর দু'আনা দাও ভাই আজ। কাল তোমাকে অন্তত কিছু শোধ দেব। না হয় ভাতের থালাটাও বেচ্‌ব, আর কি হবে।"

মেজবৌ লোক খারাপ নয়। সে দু'আনা আরও সংগ্রহ করিয়া দেয়।

সন্ধ্যার সময়ই হরিপদকে খাওয়াইয়া, আমানি ও ফ্যানের সঙ্গে খানিকটা জল মিশাইয়া পারুল ছেলেমেয়েদের এক এক বাটি খাওয়াইয়া দেয়। তারপর বলে, "তুমি দোর দিয়ে শোও, এসে ডাকলে দোর খুলে দিও"—

হরিপদ বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি চললে কোথায় এত রাত্রে?"

"কালীঘাটে পূজো, মানসিক ছিল, অন্তত পাঁচ পয়সাও ত দিতে হবে।···ওদের বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে যাবো।"

হরিপদ অবাক হইয়া যায়। পারুল একা, বিশেষত পায়ে হাঁটিয়া পাশের বাড়ীতেও যায় না! সে প্রশ্ন করিল, "পয়সা পেলে কোথায়?"

"মেজবৌয়ের কাছে ধার করেছি।"

*

পারুল নিঃশব্দে বাহিরে গিয়া দাঁড়ায়। যৌবন আর তাহার নাই। উপবাসে তাহার সমস্ত দেহ পাকাইয়া গিয়াছে সুতরাং বাহিরে একা যাইতে আর ভয় করে না। ইচ্ছা করিয়াই সে ময়লা কাপড় পরিয়া আসিয়াছিল। গলির মোড়ে আসিয়া একটি বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোককে প্রশ্ন করে, "বাবা কালীঘাট যাবো কোন্ পথে? বাসে উঠব আমি—"

ভদ্রলোকটি বাসের রাস্তা দেখাইয়া দেন। পারুল আরও দু'একবার জিজ্ঞাসা করিয়া বাসে উঠে। কালীঘাটেও পৌঁছায়।

ভিতরে গিয়া মাকে দর্শন করিয়া বাহিরে আসিয়া যখন দাঁড়ায় তখন তাহার পা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। অথচ উপায় নাই। সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত

লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া মাথায় কাপড় আরও একটু টানিয়া দিয়া সে কোনমতে হাত বাড়ায়, "মা গো, একটি পয়সা দাও মা! স্বামী তিনদিন অনাহারে!…"

ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া চার আনা মাত্র পাওয়া গেল। আরও আগে আসিলে হয়ত আরও মিলিত, কিন্তু এখন ভিড় কম। শ্রান্ত পারুল ধপ্ করিয়া মন্দিরের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আসিবার সময় দুই আনা বাসে খরচ হইয়া গিয়াছে, মেজবৌয়ের পয়সা, বাড়ী ফিরিয়া আগে সে পয়সা ফেরৎ দিতে হইবে। আর যাইবার সময়ও যদি বাসে ফেরে তাহা হইলে এই অপমান, এই লজ্জা এই পরিশ্রম সমস্তই বৃথা হইবে। পারুলের যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। সে আবার উঠিয়া দাঁড়ায়। ভিক্ষা তাহার চাই-ই আরও কিছু—অন্তত আরও দু'আনা।

কিন্তু তখন লোক খুবই কম। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া যখন গুটিদশেক পয়সা সংগ্রহ হইল তখন রাত্রি গভীর হইয়া গিয়াছে—পথ হইয়া উঠিয়াছে জনবিরল।

এতক্ষণ শুধু পয়সার কথাই মনে ছিল, বাড়ী ফিরিবার কথা একবারও মনে হয় নাই। এখন সে সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আন্দাজে আন্দাজে বাসের রাস্তায় আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন বাস চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হয় ফিরিয়া গিয়া মন্দিরে বাকি রাতটা কাটাইতে হইবে নয়ত হাঁটিয়া এতটা পথ একা ফিরিতে হইবে।…

মন্দিরে রাত কাটানো অসম্ভব। ফিরিতে রাত হইতেছে দেখিয়া হরিপদ যদি খোঁজ-খবর করে এবং জানিতে পারে সে একাই আসিয়াছে তাহা হইলে বিশ্রী ব্যাপার হইবে—চেঁচামেচি, জবাবদীহি, লোক জানাজানি—সে অসম্ভব। পারুল ঘামিয়া উঠিল।…সে শুনিয়াছিল বহু ভদ্রলোকের মেয়েই রাত্রে কালীঘাটে ভিক্ষা করিয়া আনে, তাই তিন-চারিদিনের নিরম্বু উপবাস এবং ছেলেমেয়েদের কান্না সহিতে না পারিয়া মরীয়া হইয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তখন একবারও এসব কথা ভাবে নাই।

অথচ উপায়ই বা কি, এতরাত্রে একা এই সমস্ত পথটা হাঁটিয়া যাওয়া!

সেও সমান কঠিন কিন্তু পারুলের ক্লান্ত মস্তিষ্ক আর কোন উপায় চিন্তা করিতে পারিল না। সে এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া রসা রোড ধরিয়া সোজা উত্তরদিকেই হাঁটিতে লাগিল।

প্রশস্ত রাজপথ তখন জনহীন। শুধু অর্দ্ধউলঙ্গ কঙ্কালসার বুভুক্ষু নর-নারী রাস্তার ধারে ধারে পড়িয়া আছে। মধ্যে মধ্যে দু-একটা ডাস্টবিনের ধারে তখনও জীবনের লক্ষণ কিছু আছে, দু-একজন হেঁট হইয়া পড়িয়া জঞ্জালের গাদা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে—কুকুরের সঙ্গে সমান হইয়া, তাহাদের সহিত বিবাদ করিয়া! দূর গলির মধ্য হইতে তখনও দু-একটি আর্ত্তস্বর খাদ্য ভিক্ষা করিয়া নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

পারুলের তখন কোনদিকে লক্ষ্য ছিল না। প্রাণপণে, যতটা সম্ভব দ্রুত-গতিতে সে হাঁটিতেছিল। কোনমতে বাড়ী পৌঁছিতে পারিলে সে বাঁচে। ইহার চেয়ে বাড়ীতে থাকিয়া শুকাইয়া মরাও ভাল ছিল। আর কোনদিন কোন কারণে সে একা বাহির হইবে না। "হে ঠাকুর, হে মা কালী, ভালয় ভালয় বাড়ী পৌঁছে দাও মা!"

রসা রোড পার হইয়া চৌরঙ্গীতে পড়িয়া সহসা সে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচকিত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাস্তাটা জনহীন; সে একা। অতবড় চওড়া রাজপথে আর একটি লোকও নাই। পারুলের গা ছম্ ছম্ করিতে থাকে। একদিকের মাঠ ও বড় বড় গাছগুলা যেন প্রেতপুরীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কেহই নাই একটা পাহারাওয়ালাও কোথাও দেখা যায় না। পারুল ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে থাকে। ক্লান্ত পা, উপর্য্যুপরি উপবাসে শরীর অক্ষম, তবু সে থামিতে পারে না। মনে হয় আর বোধ হয় চলিতে পারিবে না,—পা একটু পরেই অবশ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে—তবু সে চলিতে থাকে প্রাণপণে।

সহসা পাশের একটা গলি হইতে কে বাহির হইয়া তাহার পিছনে চলিতে শুরু করিল। মানুষ, পুরুষ মানুষ? গুণ্ডা নয় ত? ভয়ে শুষ্ক গলা আরও শুকাইয়া ওঠে, তবু সে থামিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিতে পারে না বস্তুটা কি—

যৌবনের ভয় আর তাহার নাই, ভগবান যে তাহাকে নারীদেহ দিয়াছিলেন

একথা পারুল ভুলিয়াই গিয়াছে। তাহার তখন একমাত্র ভয় আঁচলে বাঁধা ছ'সাত আনা পয়সা যদি কেহ তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লয়? তাহার নিজের চার-পাঁচ দিন খাওয়া হয় নাই, তা না হোক্—ঘরে রুগ্ন স্বামীও দুইদিন ধরিয়া অর্দ্ধ-উপবাসী আছেন আর ছেলেমেয়েরা—না, এ পয়সা সে কিছুতে কাহাকেও দিতে পারিবে না, প্রাণ থাকিতে না—।

সে গতি আরও বাড়াইতে চায় কিন্তু পা চলে না। সমস্ত শরীরে বৃষ্টির জলের মত ঘাম ঝরিতেছে, দুই কষে ফেনা জমিয়া উঠিয়াছে পরিশ্রান্ত ঘোড়ার মত। তবু চলিতে হইবে—পিছনের শব্দ আরও কাছে আসে যে, "হে মা কালী, হে ঠাকুর!"

আর একটু, আর একটু জোরে চলিতে পারে না সে? না, সম্ভব নয়। একটা মানুষ কোথাও দেখিতে পাইলে বাঁচে যে! আলো নাই কি পৃথিবীতে? এ কী পোড়ার যুদ্ধ বাধিল, আলো পর্য্যন্ত জ্বালিবার উপায় নাই রাস্তায়, আশ্চর্য্য!

ওপাশের ফুটপাত ধরিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু অন্ধকার গাছপালাগুলা যেন দৈত্যের মত গিলিতে আসে—সাহস হইল না, রাস্তার মধ্যপথ হইতেই ফিরিয়া আসিল। পিছনের শব্দ আরও কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। পারুল আঁচলের পয়সাটা সজোরে মুঠা করিয়া ধরিল। তাহাকে না মারিয়া কেহ এ কয় আনা পয়সা লইতে পারিবে না—

পিছন হইতে শব্দ আসিল, ক্ষীণ—প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বরের মতই ক্ষীণ, কম্পিত, "মা, মাগো, কিছু খাবার আছে কি সঙ্গে, দিবি মা? আর যে পারিনে!"

চমকিয়া উঠিয়া পারুল ফিরিয়া চাহিল। আর একটি স্ত্রীলোক ছেঁড়া কানি পরণে, সরু বেতের মতই ক্ষীণ—আর কিছু দেখা গেল না অন্ধকারে। যাক্, গুণ্ডা নয়, ভিখারী—হয়ত তাহারই মত একদিন ভদ্রঘরের বধূ ছিল।

উঃ—

নিমেষে যেন পৃথিবীর সব হাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। নক্ষত্রের আলোও আর দেখা যায় না—আকাশ কি মেঘে ঢাকিয়া গেল! আলো হাওয়া কি কোথাও নাই!

পারুল ফুটপাতের উপরই, কোন এক বিফল-দেওয়াল ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল। পা দুটাও অবশ হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় পক্ষাঘাতই হইল।

জল, একফোঁটা জল পাইলে বোধ হয় বুকের এ যন্ত্রণাটা কমিত। জল— পারুল একবার তাকাইতে চেষ্টা করিল, কিছু দেখা যায় না। চোখও মেলিতে ইচ্ছা করে না।

কোন্ দূর প্রান্তরের অপরপার হইতে অতি ক্ষীণ একটা শব্দ ভাসিয়া আসে, "মা, কি হ'ল মা—?"

পারুলের সমস্ত চৈতন্য তখন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। বুকে একটু যন্ত্রণা হয় শুধু, বোধ হয় ঘুমাইতে পারিলে এ যন্ত্রণাটাও চলিয়া যাইবে। সে মাথা তুলিবার চেষ্টাও করে না, চোখও মেলিতে চায় না।

শুধু রাস্তার উপরেই ধীরে ধীরে এলাইয়া পড়ে।

চাঁদের আলো

অভয় অভ্যাসমত বাজার করিতে ঢুকিল বটে কিন্তু সেদিন বাজার করিবার মত তাহার মানসিক অবস্থা নয়।

সেদিন কাহার মুখ দেখিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল তাহা স্মরণ নাই, তবে এরূপ দুর্দ্দিন তাহার জীবনে বোধকরি কখনও আসে নাই। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া স্ত্রীর সহিত ঝগড়া বাধিল খুব তুচ্ছ কারণ লইয়া। একটি জামা তিনদিন ধরিয়া কাচিতে বলা সত্ত্বেও মলিনা কাচে নাই, হয়ত সময়ও পায় নাই। কিন্তু আর যে একটি মাত্র ছেঁড়াজামা অসময়ের জন্য তোলা ছিল সেটি সে ঘর মুছিতে দিল কোন্ আক্কেলে? ভোর বেলা উঠিয়াই নজরে পড়িল যে, যে ছেঁড়া জামাটির উপর সেদিন একান্ত ভরসা সেই জামারই অর্দ্ধেকটা ছিঁড়িয়া লইয়া ছোট বোন মীনু ঘর মুছিতেছে।

মানুষের মেজাজ খারাপ হইবার পক্ষে এই কারণটাই যথেষ্ট ছিল, তাহার

উপর মলিনা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "আজ কয়লা এলে তবে উনুনে আগুন পড়বে—এই বলে দিলুম্ !"

অভয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তার মানে ?···কাল কি ঘুমুচ্ছিলে ?"

মলিনা ঈষৎ ঝাঁঝের সহিত জবাব দিল, "মানুষের মনের গতিক সব দিন সমান থাকে না। কি করব ! সব কথা যে সব সময়ে মনে করে রাখতে হবে এমন কিছু লেখাপড়া নেই।"

অভয় আঙ্গুল দিয়ে মীনুর দিকে দেখাইয়া কহিল, "সে-ত না হয় নেই, কিন্তু ওটা কি হয়েছে, জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?"

মলিনা হয়ত একটু অপ্রস্তুত হইল কিন্তু দমিল না, জবাব দিল, "কী ছিল জামাটাতে ? ওকি আর পরা চলত ?"

অভয় বলিল, "পুরোনো জামাটাতে সাবান দিলে না। ফরসা জামাটা ছিঁড়ে ঘর মুছতে দিলে, তারপর ? আমি সাহেবের কাছে যাই কি ক'রে ? আজ যেতেই হবে, একথা তিন দিন ধরে বলছি যে !"

মলিনা হাত মুখ নাড়িয়া কহিল, "পারব না। পারব না আমি, অত দুঃখের পেছনে দড়ি দিতে ! কি হবে ? মেরে ফেল্‌বে আমায় ? তাই না হয় ফেল, আমিও বাঁচি তুমিও বাঁচ।"

তাহার পরই দুম্-দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অভয় ছাড়িবার লোক নয়, সে-ও কতকগুলি গালি-গালাজ করিল, মীনুকে অকারণে একটা চড় বসাইয়া দিল, তাহার পর কয়লা ও বাজার লইয়া যতটা সম্ভব দেরি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া না খাইয়াই অফিস চলিয়া গেল।

অফিসে গিয়াই দুঃসংবাদ ; ইন্‌ক্রিমেণ্ট লিস্ট্ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে অভয়ের নাম নাই। গত তিন চার মাস একটু বেশী রকম 'লেট' হইতেছে, বোধ করি এটা তাহারই শাস্তি ! কিন্তু সে জন্যও দায়ী মলিনা।

যাক্—

তারপর সাহেবকে যে বিশেষ হিসাবটা বুঝাইবার কথা, সে হিসাবটি এক রকম তাহার মুখস্থই ছিল। কিন্তু মানসিক বিশৃঙ্খলতার জন্য সেটা বুঝাইতে

গিয়া সে তিনবার ধমক খাইল। তাহার উপর তাহার ময়লা জামাটার দিকে সাহেব তিন চারবার চাহিয়া দেখিলেন সেটাও সে বেশ অনুভব করিল।

আবার বাহিরে আসিয়া কো-অপারেটিভের বাবুর কাছে শোনা গেল যে, যে ঋণটার জন্য সে মাসখানেক আগে দরখাস্ত করিয়াছে, কী একটা গোলমালের জন্য গতকল্যকার মিটিংএ সে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই, আগামী মাসের মিটিং-এর জন্য সরাইয়া রাখা হইয়াছে।

এতগুলি দুর্ঘটনায় কোন্ ভদ্রলোকের মেজাজ ভাল থাকে! সুতরাং সেদিন যে বাজারে অভয়ের মন বসিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তবুও সে বাজারে ঢুকিয়া চিরকালের অভ্যাসমত কতকগুলি আলু বেগুন কিনিল, তাহার পর একটা দোকানে গিয়া সমস্ত দিন পরে খানকতক লুচি খাইয়া একটু জল খাইল, তাহার পর যথা সময়ে শিয়ালদহ স্টেশনে আসিয়া একটা ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

ট্রেন ছাড়িবার তখনও খানিকটা বিলম্ব ছিল। বসিয়া বসিয়া সমস্ত দিনের ইতিহাসটা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। কী কারণে তাহার ঘরে বাহিরে এত লাঞ্ছনা? এত কষ্ট, এত দুঃখ এত ছুটাছুটি কাহার জন্য? লোকে বিবাহ করিয়া স্ত্রী ঘরে আনে কি কারণে? সুখ শান্তি সুবিধার জন্যই ত? মানুষের স্ত্রী শোকে সান্ত্বনা দেয়, দুঃখের সময় দুঃখ মোচন করিবার উপায় খোঁজে, যতটুকু পারে সংসারের ভার লাঘব করিবার চেষ্টা করে। আর মলিনা? তাহার অফিসটা ঘুচিয়া গেলে যে উপবাস করিয়া মরিতে হইবে, সে কথাটা পর্য্যন্ত সে একবার ভাবিয়া দেখে না। তাহার অভাব-অভিযোগের দিকে লক্ষ্যই নাই! এরূপ স্ত্রী থাকিবার সার্থকতা কি?

অভয় যতই কথাগুলি ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মাথা আরও গরম হইয়া উঠিল; শেষ পর্য্যন্ত যখন ট্রেনটা তাহার বাড়ীর স্টেশনে আসিয়া থামিয়াছে, তখন তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে, কালই সে মলিনা ও খুকীকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিবে এবং মীনুকে ও জিনিষপত্রগুলি মামার বাড়ী পাঠাইয়া মেসে গিয়া থাকিবে।

দরকার কি তাহার এই ভূতের বোঝা বহিবার? ঘর-সংসার যে করিতে চায় করুক্—সে করিবে না।

কিন্তু স্টেশনের বাহিরে পা দিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত, সমস্ত ঘাট-মাঠ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে, সেই নির্ম্মল আকাশ ও পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া তাহার মনের মধ্যেটায় কি রকম গোলমাল হইয়া গেল। তাহার উপর বাতাসটাও সেদিন সোজা দক্ষিণ হইতে বহিতেছে, একেবারে ফাল্গুনের হাওয়া—

সে কতকটা অভিভূতের মতই পথ চলিতে লাগিল। বাড়ীর পথের সেই চিরপরিচিত রাস্তাটিরও যেন রূপ বদলাইয়াছে; যে পচা ডোবাটাকে অন্যদিন অতি কদর্য্য বলিয়া বোধ হয়, আজ তাহারই কালো জল ও সবুজ পানার উপর চাঁদের আলো পড়িয়া যেন অত্যন্ত মনোরম দেখাইতেছে। বাঁশের ঝাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে, লিচুগাছের পাতায় পাতায়, মাঠের উপরের সবুজ ঘাসে, একই চাঁদের আলোর নব নব রূপ। রাস্তার ধারে বাড়ীগুলিরও কি চেহারা বদল হইল? অন্যদিন ত এত ভাল দেখায় না।

সহসা তাহার মলিনার কথা মনে পড়িল। মনে হইল তাহার বিবাহের আটদিনের মধ্যেই মাঘী পূর্ণিমা পড়িয়াছিল; সকলে ঘুমাইবার পর তাহারা বাড়ীর ছাদে উঠিয়া সারা-রাত আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া আর গল্প করিয়া কাটাইয়াছিল। উঃ—সে দিনের কথাটা মনে হইলে আজও এক বিচিত্র পুলকে সারা গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে!

বেচারী মলিনা!···তাহারই বা অপরাধ কি? দুঃখ কষ্টের সংসারে আসিয়া একটি দিনের জন্যও সে সুখের মুখ দেখিতে পাইল না। শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, আদর করিবার লোক নাই; প্রথম দিনটি হইতেই হাঁড়ি-বেড়ি ধরিতে হইয়াছে। প্রথম যৌবনের কত সাধ-আহ্লাদ তাহার মনের মধ্যেই গুমরিয়া মরিয়াছে, কে তাহার খবর রাখে? এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে একটা মিষ্ট কথাও ত সে কাহারও কাছে শুনিতে পায় না!···

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া বকুলতলার মাঠের সামনে সে খানিকটা চুপ

করিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত মাঠটা জুড়িয়া চাঁদের আলো ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছে, তাহারই ওপাশে মুখুজ্জেদের বড় পুকুরটার স্বচ্ছ জলের উপর পড়িয়া ঝিক্‌-মিক্‌ করিতেছে, লক্ষ হীরক খণ্ডের মত। বহুক্ষণ সে সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ; নিস্তব্ধ প্রান্তর আর সুগভীর জলের উপর সেই বহুদিনের পরিচিত জ্যোৎস্নার যে এমন অভিনব রূপ দেখা যায়, তাহা সে কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। সেদিকে চাহিয়া তাহার মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। মনে হইল যে কয়দিনেরই বা এ জীবন ? এই অল্প অবসরের মধ্যে যেটুকু পারা যায় সেইটুকুই আনন্দ উপভোগ করিয়া লইতে ক্ষতি কি ? কী হইবে দুঃখকে আরও দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়া ?…

অনেকক্ষণ পরে কতকটা অভিভূতের মতই সে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। তখন আরও একখানা ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, রাত্রি কতকটা গভীর হইয়া আসিয়াছে ; হয়ত মলিনা ভাবিতেছে, সে রাগ করিয়াই ফিরিতেছে না। বেচারী মলিনা ! কত রকমই তাহাকে সহিতে হয় !

বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল যে তাহারই অনুমান সত্য। সমস্ত রান্না সারিয়া মলিনা চুপ করিয়া বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া আছে। মীনু বোধ করি শুইয়া পড়িয়াছে।

আরও কাছে আসিয়া লণ্ঠনের আলোয় চোখে পড়িল যে [illegible]াও সেদিন যেন বিশেষ করিয়া সাজিয়াছে ; কবরীটি সযত্নে রচিত, [illegible]খ বহুদিন পরে পাউডারের আভাস, পরণে দেশী সাড়ী। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা অভয়ের মনে হইল, মলিনার ঠোঁট দুটি ত বেশ !…চোখের ভাবটিও বেশ আবেগ-ছলো-ছলো !

অকস্মাৎ যেন তাহার বুক দুলিয়া উঠিল, সারা দেহ কেমন একটা আবেগে কাঁপিয়া উঠিল, সে বাজারের পুঁটুলিটা ধপাস্‌ করিয়া নামাইয়া মলিনার হাতদুটি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "লীনা, লক্ষ্মীটি, আমার ওপর রাগ করো নি ত ?"

দিন, মাস, বৎসর, যুগ এক লহমায় এমনি করিয়াই পিছাইয়া যায়। এমনি করিয়াই প্রৌঢ়ত্ব, যৌবন অতিক্রম করিয়া মানুষ সহসা এক সময় আবার কৈশোরের রঙীন আবেগকে খুঁজিয়া পায়। সে মুহূর্ত্তও যাহার জীবনে আসিল না, তাহার মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই।

অপরাধ

নীচেরতলা হইতে পূজারীর কণ্ঠস্বর আবারও উপরে আসিয়া পৌঁছিল, "মা নীচে আসবেন না! ভোগ সরে গেছে অনেকক্ষণ, আরতির দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!"

মহেশ্বরী লজ্জিত কণ্ঠে সাড়া দিলেন, "এই যে যাই বাবা, এখনই যাচ্ছি।" তাহার পর, বহুবারের পড়া চিঠিখানা যেন কতকটা জোর করিয়াই খামে মুড়িয়া তাকের উপর ভাগবতের আধারের নীচে গুঁজিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

ভোরে উঠিয়া ঠাকুরের ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই মহেশ্বরী স্নান সারিয়া দশ সহস্রবার জপ সারিয়া লন। তারপর প্রাভাতিক আরতি, পূজা, বাল্যভোগ প্রভৃতি নিত্যসেবার কাজগুলি যতক্ষণ না সারা হয় ততক্ষণ তিনি নীচেই বসিয়া থাকেন, একেবারে পণ্ডিতজী ভাগবত পাঠ শেষ করিয়া চলিয়া গেলে আবার উপরে উঠিয়া নিজের ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজা ও বাকী নব্বুই সহস্রবার নাম জপ শেষ করেন। ইতিমধ্যে পূজারী পাক করে, ভোগ লাগায়, এক ঘণ্টা পরে ভোগ সরায়—তাহার পর ঘর পরিষ্কার করিয়া ঠাকুরের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আরতির সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে করিতেই মহেশ্বরী নীচে নামিয়া আসেন। দ্বিপ্রহরের এই শয়ন-আরতিটি বিশেষ ঘটা করিয়াই হয়, মহেশ্বরী নিজে ঘড়ি বাজান—একদিনও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। ইহাই তাঁহার নিত্যকার নিয়ম করা কার্য্য-তালিকা, কোনদিন, কোন কারণেই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। এক লক্ষ নাম জপও তাঁহার চাই—এই জপ শেষ হওয়ার আগে তিনি কোনদিনই একবিন্দু জল মুখে দেন না।

কিন্তু কাল হইতে সব যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে। যোল বৎসর পরে দেশ হইতে ছোট ভাই সুরেন চিঠি লিখিয়াছে। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে দেশের কোন সংবাদই তিনি পান নাই, অবশ্য সেজন্য ব্যস্তও ছিলেন না তিনি, নিজেও খবর লন নাই। ঠিক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেশ ছাড়িয়াছেন, আর কখনও ফিরিয়া যান নাই—বস্তুত বৃন্দাবন-মথুরা-গোকুল-গোবর্দ্ধন, এই ব্রজমণ্ডলের বাহিরে আর তিনি পা দেন নাই। প্রথম প্রথম তবু দেশ হইতে চিঠি আসিত, তাঁহাকেও জবাব লিখিতে হইত—দুই-এক বৎসর অন্তর লোকও কেহ কেহ আসিয়াছে, কিন্তু এই গত যোল বৎসরের মধ্যে একটি লোক বা সংবাদ, কিছুই আসে নাই। তিনিও সেসব কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন একেবারে। গোপীমোহনের সেবা এবং নামজপ—এই দুটি কাজ ছাড়া পৃথিবীর কোন-কিছুর সঙ্গেই আর তাঁহার সম্পর্ক নাই। আজ এই এতদিন পরে আবার সুরেন তাঁহাকে সেই বহুদিনের ছাড়িয়া আসা এবং ভুলিয়া-যাওয়া সংসারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে! তাঁহার ছোট ভাই সুরেন—তিনি যখন সংসার ত্যাগ করেন তখন সুরেনের বয়স ছিল মাত্র তিন বৎসর। সত্য কথা বলিতে কি, সেদিন এই সুরেনের জন্যই তাঁহার একটু কষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পর তিনি আর দুইবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছেন, শেষ যখন সুরেন এখানে আসে, তখন তাহার বয়স চব্বিশ। সুন্দর, সুশ্রী তরুণ।

কিন্তু শুধু সুরেনের চিঠি আসিয়াছে বলিয়াই তিনি অত উতলা হন নাই। সুরেনের প্রতি তাঁহার যে বাৎসল্য একদা ছিল, আজ তাহার উৎস পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার চেহারাও আর মহেশ্বরীর মনে নাই। তিনি উন্মনা হইয়াছেন, সে চিঠি যে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, সেই বিশেষ সংবাদটিতে। সুরেনের প্রথম সন্তান কন্যা। সে কন্যা আজ বিবাহযোগ্যা, তাহার বয়স না কি আঠারোয় পড়িয়াছে। এ সব খবরই আজ তাঁহার কাছে নূতন। কিন্তু তবুও বিস্ময়ের কারণ তাহাতে নাই। সেই মেয়েটি, পারুল বুঝি তাহার নাম, দূর হইতে তাহার পিসীমার খ্যাতি শুনিয়া সহসা তাঁহার জীবনের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে। সে না কি শৈশব হইতেই গৃহদেবতার

পূজার সমস্ত কাজ নিজে করিত, বারো বৎসর বয়স হইতে দীক্ষা, পূজা, ধ্যান-ধারণা সব আয়ত্ত করিয়াছে—ব্রত-উপবাসের কঠোরতাতে গ্রামের সমস্ত বিধবা মহিলাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই শেষ নয়, সে আবার এখন সন্ন্যাস লইতে চায়। বিবাহের প্রস্তাবে অন্নজল সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেবতার দ্বারে ধন্না দিয়াছিল, তিন দিনের মধ্যে তাহাকে কেহ এক কোঁটা জল খাওয়াইতে পারে নাই। এখন তাহার বুলি, সে পিসিমার চরণে আশ্রয় লইবে, গোপীমোহনের সেবাতে সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—দূর হইতেই। মীরাবাইয়ের মত তাহার মনের অবস্থা—গোপীমোহনই তাহার স্বামী, অন্য স্বামী গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।……

রাধে! রাধে!

মাধুকরী-প্রার্থী এক বাবাজীর কণ্ঠস্বরে আবারও মহেশ্বরীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন পূজারী অপ্রসন্ন মুখে আরতির দীপ সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে, দাসী বিশাখা একটা ঘড়ি হাতে চুপ করিয়া বসিয়া—আর ঠাকুর, তাঁহার মুখে যেন ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি। মহেশ্বরী তাড়াতাড়ি প্রণামটা সারিয়া লইয়া অবশিষ্ট ঘড়িটা তুলিয়া লইলেন।

আরতি আরম্ভ হইল। মহেশ্বরী অস্ফুট-স্বরে স্তব গান করিতে করিতে ঘড়ি বাজাইতেছেন, দৃষ্টি তাঁহার রাধারাণীর মুখের দিকে নিবদ্ধ, অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষুর দুই কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে—এ তাঁহার নিত্যকার চেহারা। তবু তাঁহার সেই ঈষৎ শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, তপঃক্লিষ্ট মুখ এবং শুভ্র মস্তকের সঙ্গে এই ভক্তিগদ-গদ ভাবের এমন একটা মধুর সামঞ্জস্য ঘটে যে সেদিকে একবার চাহিলে, যত পরিচয়ই থাক্ মাথা আপনিই নত হয়।

বিগ্রহের দিকে চাহিয়া আছেন বটে, কিন্তু তবু কখন সে আরতি থামিয়া গিয়াছে তাহা তিনি টের পান নাই। সুন্দর হঠাৎ 'মা' বলিয়া ডাকিতে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি তাঁহার এই অন্যমনস্কতার অপরাধে শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি নাটমন্দিরের পাথরে লুটাইয়া পড়িলেন, ঠাকুর এ তোমার কী লীলা! যে সংসারের নাম পর্য্যন্ত তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে মনে

গর্ব্ব করিতেন, সেই সংসারের একখানি মাত্র চিঠিই তোমার সেবা ভুলাইয়া দিল ? ছি, ছি, এত ভঙ্গুর তাঁহার মন ! কোন গর্ব্বই কি তুমি রাখিবে না ঠাকুর ?

বহুক্ষণ নতমুখে পড়িয়া থাকিয়া অশ্রুজলে সমস্ত অপরাধ দেবতার চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া মহেশ্বরী যখন তুলসীমঞ্চের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি অনেকটা যেন প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বৃন্দা পূজা, তুলসীমঞ্চে রক্ষিত গোবর্দ্ধন শিলার পূজা, মহাবীরের পূজা এ সমস্তই তিনি এই সময়টায় নিজে হাতে করেন—আজও তাহার ভুল হইল না। উপকরণগুলি হাতে তুলিয়া লইয়া একে একে পূজা সারিতে লাগিলেন। এ বৃদ্ধ বয়সে আর মায়ার বশীভূত হইলে চলিবে না, সাংসারিক প্রসঙ্গ আর নয়। এত দিনের কৃচ্ছ সাধন, এতদিনের তপস্যা সব ভুলিয়া আবার যদি এই সব তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতে হয়, তাহা হইলে এত কাণ্ডের প্রয়োজন কি ছিল ? পারুল আসিতে চায় আসুক, গোপীমোহনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে চায় ভালই। তিনি তাহাকে নিজে হাতে গড়িয়া তৈরী করিয়া যাইতে পারিবেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে গোপীমোহনের সেবা কে করিবে এ চিন্তা তাঁহার মনে ছিল বৈকি—গোপীমোহনই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। মহেশ্বরী এখন নিশ্চিন্ত হইয়া রজে মিশিয়া যাইতে পারিবেন।

সুন্দর আসিয়া ডাকিল, "মা" !

মহেশ্বরী প্রণামটা সারিয়া লইয়া স্নিগ্ধ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া জবাব দিলেন, "কেন বাবা ?"

"আজ তোমার কি হয়েছে বলো ত ? এমন অন্যমনস্ক দেখছি কেন ?"

"ও সবই ওঁর লীলা বাবা, পরীক্ষার ত শেষ হয় না কোন দিন। থেকে থেকে উনি নেড়ে চেড়ে বাজিয়ে দেখেন।"

সুন্দর আর প্রশ্ন করিল না। নীরবে মালা হাতে করিয়া তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।......

সত্যই পরীক্ষার শেষ নাই। ঠাকুর কত রকমেই মায়ায় ফেলিবার চেষ্টা করেন। এই সুন্দর ছেলেটিই, কেমন করিয়া আসিয়া জুটিল এবং ধীরে

ধীরে গোপীমোহনের প্রতি মহেশ্বরীর যে অপত্য-স্নেহ তাহাতে ভাগ বসাইল—আশ্চর্য্য !

সুন্দর উহার নাম নয়। উহার নাম অনন্ত। এম-এস-সি পাশ করিয়া কিসের ঝোঁকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে তীর্থভ্রমণে, তাহার পর বৃন্দাবনে আসিয়া রাধারমণের গোঁসাই-এর কাছে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা লয়। গুরুগৃহে থাকিতে থাকিতেই মহেশ্বরীর সাধনার খ্যাতি কানে পৌঁছিয়াছিল, একদিন দর্শন করিতে আসিয়া এমনই অভিভূত হইয়া পড়িল যে এইখানেই—সাধক বৈষ্ণবদের জন্য রক্ষিত কয়েকটি ঘরের একটিতে—সে আশ্রয় লইল। মহেশ্বরীও ছেলেটির সুন্দর চেহারা, মধুর স্বভাব, অসাধারণ নিষ্ঠা এবং সর্ব্বোপরি একাগ্র সাধনায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। নাম জপ, কীর্ত্তন, পূজা—এই সব লইয়াই ছেলেটি দিন-রাত বিভোর—অন্য কোন কথা বা চিন্তা তাহার আর নাই। সুন্দর নাম তাহাকে মহেশ্বরীই দিয়াছেন। গোপীমোহনের পরেই এই ছেলেটি বোধ করি তাঁহার সব চেয়ে প্রিয়।...

পরিক্রমা শেষ করিয়া সুন্দর আবারও ডাকিল, "মা"।

মহেশ্বরী মহাবীরের প্রণাম সারিয়া উঠিয়া জবাব দিলেন, "কেন বাবা ?"

"আজ যে তোমার কে সব আত্মীয়রা আসবেন বলছিলে—"

মহেশ্বরী যেন চমকিয়া উঠিলেন, "আজ ?"

"আজই ত আসবার কথা, বললে কাল !"

তা বটে। আজই বারো তারিখ—তাহারা এগারো তারিখে রওনা হইবে কলিকাতা হইতে লিখিয়াছে। আজই অপরাহ্নে পৌঁছিবার কথা।

"হ্যাঁ, আজই আসবে।"

"আমি কি তাহ'লে ওখানে গিয়ে থাকব দিন-কতক ?"

"কেন ? ঘরের অভাব কি ! তোমাকে ঘর ছাড়তে হবে কেন বাবা ?"

"না—ঠিক ঘরের অভাব নয়—"

মধুর হাস্যে মহেশ্বরীর ওষ্ঠাধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "পালাতে চাস বুঝি ? ছি, সংসারের সংস্রব কি পালিয়ে এড়ানো যায় পাগল ?

কত দিন পালিয়ে বেড়াবি? আর তা ছাড়া সে মেয়েটি ত এখানেই থাকবে এর পর থেকে—বাকী যারা, দিন-কতক থেকেই চলে যাবে।"

সুন্দর আর কোন কথা না কহিয়া মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারের সামনে আবার জপে বসিল। মহেশ্বরীও তাঁহার পূজাদি সারিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। তখনও তাঁহার লক্ষ নাম-জপের প্রায় সমস্তই বাকী।

ঠিক সন্ধ্যার সময় পারুলরা আসিয়া পৌঁছিল। সে এক নাটকীয় মুহূর্ত্ত। পূজারী প্রথম প্রদীপের আরতি শেষ করিয়া ঝাড়টি নামাইয়াছে এমন সময় মোটঘাট সমেত সুরেন, সুরেনের স্ত্রী মনোরমা ও পারুল মন্দির-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। ঝাড়ের অসংখ্য প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে যে দৃশ্য পারুলের চোখে পড়িল, তাহাতে নিমেষে তাহার চোখ ধাঁধিয়া গেল। ঠিক সামনে অসংখ্য মণি-মাণিক্যখচিত স্বর্ণালঙ্কার ও গুঞ্জামালায় সজ্জিত গোপীমোহন এবং দ্বারের দুই পাশে সুন্দর ও মহেশ্বরী। সুন্দরের অনাবৃত দেহের উপর উত্তরীয়টা শুধু দু'দিক দিয়া ফেলা, প্রশস্ত শুভ্র ললাটে ও বিস্তৃত বক্ষে গোপীচন্দনের তিলক, নিমীলিত নেত্রে প্রেমাশ্রু, আর মহেশ্বরীর শুভ্র গরদের থান, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ এবং সর্ব্বোপরি মুখে সেই তপস্যার দীপ্তি। দুজনেরই হাতে ঘড়ি, মহেশ্বরীর ওষ্ঠে অর্দ্ধোচ্চারিত স্তবগান—সমস্তটা মিলাইয়া সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দুজনেই একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, তারপরই মহেশ্বরীর দৃষ্টি আবার ফিরিয়া গেল গোপীমোহনের দিকে, সুন্দর মাথা নত করিল। কিন্তু পারুল অভিভূত হইয়া সেইখানেই, উঠানের উপরই লুটাইয়া পড়িল।

মনোরমা তাহার না-দেখা এই ননদটির উপর বিশেষ খুশী ছিল না, বোধ হয় মেয়েকে পর করিয়া লইবার একটা অভিযোগ ছিলই মনে মনে, কিন্তু সেও মহেশ্বরীর সেই ভক্তি-তদ্গত মুখের দিকে চাহিয়া বিচলিত না হইয়া পারিল না, বিগ্রহকে বামে রাখিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিবার পর ননদেরই কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। শুধু সুরেনের কাছে এ দৃশ্য কতকটা পরিচিত, সে গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি চুকাইয়া দিয়া মোটঘাটের তদারক করিতে লাগিল।

আরতি শেষ হইলে মহেশ্বরী ভাল করিয়া পারুলকে দেখিলেন। ষোল সতেরো বছর বয়স, রংটা খুব উজ্জ্বল না হইলেও দেখিতে সুশ্রী, সর্ব্বোপরি প্রথম যৌবনের মাদকতা সমস্ত মুখে-চোখে উজ্জ্বল, সেদিকে চাহিলে স্ত্রীলোকেরও যেন নেশা লাগে। সুন্দর প্রণাম সারিয়া একবার সেদিকে চাহিয়াই মাথা নত করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। মুহূর্ত্ত-দুই তাহার অপস্রিয়মান মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহেশ্বরী যেন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, তাহার পর তাঁহারই চরণে লুন্ঠিতা পারুলকে একেবারে বুকে টানিয়া লইয়া শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "পথে কোন কষ্ট হয় নি ত সুরেন? গাড়ীতে ভিড় ছিল কেমন?"

তাহার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পূজারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা শোভারাম, লালুকে বলো এদের মোটঘাটগুলো দোতলায় তুলে দিক, আর এদের স্নানের জল দিক্,—"

ক্লান্ত অতিথিদের স্নান, বিশ্রাম ও জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া মহেশ্বরী আবার যখন নাটমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন ভোগের জন্য মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, বাহিরে শুধু সুন্দর জপ শেষ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। মহেশ্বরীকে দেখিয়া যেন কতকটা চমক্ ভাঙ্গিয়া প্রশ্ন করিল, "কাজ মিটল মা?"

"হ্যাঁ, বাবা। এইবার বাকী জপটা সেরে নিতে হবে।"

তাহার পর সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "পারুলকে কেমন দেখলে বাবা সুন্দর?"

সুন্দরের শুভ্র মুখে কে যেন খানিকটা আবির ছড়াইয়া দিল। তাহা সেই অস্পষ্ট আলোকেও মহেশ্বরীর চোখে পড়িল। সুন্দর যেন খানিকটা থতমত খাইয়া জবাব দিল, "আমি ত ভাল ক'রে দেখি নি মা।"......

তাহার পর কি মনে করিয়া মাথা আরও নত করিয়া বলিল, "দেখলেও তেমন লক্ষ্য করি নি।"

মহেশ্বরী আর কোন কথা কহিলেন না। রাত্রে সকলে একসঙ্গে প্রসাদ পাইলেন। এতগুলি অপরিচিত লোকের সামনে সুন্দরের ভাল করিয়া খাওয়া হইবে না, তাহা মহেশ্বরী জানিতেন, তবু তাহার লজ্জা ভাঙ্গিবার জন্যই জোর করিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন। তিনি জানিতেন সহজ হইতে না পারিলে ভয়ের কারণ যাইবে না।

রাত্রে আহারাদির পর সুরেন ও মনোরমা ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু পারুল শুইতে গেল না, ছাদের উপর মহেশ্বরীর কাছে আসিয়া বসিল। মহেশ্বরীও বাধা দিলেন না, কি করিয়া এই অল্পবয়সী মেয়েটি তাঁহাকে না দেখিয়াই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, সে কথাটা জানিবার কৌতূহল ছিল বৈকি।

পারুল আপন মনেই বকিয়া চলিল। কেমন করিয়া বাল্যকালে বৈরাগীদের গানে আপনা হইতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িত, ছ'বৎসর বয়সেই সে এক বৈষ্ণবঠাকুরের সঙ্গে কেমন করিয়া গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল, পূজার ঘরেই তাহার যে দিনেরাতে সাত-আট ঘণ্টারও বেশী কাটিত, গৃহদেবতার শুধু পূজা ছাড়া সেবার সমস্ত ভারই সে যে দশ বৎসর বয়স হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে, এমনি অনেক কথাই সে বলিয়া গেল। মহেশ্বরীকে না দেখিলেও তাঁহার আশ্চর্য্য তপস্যার কাহিনী শুনিয়া যে শৈশব হইতেই ভক্তিতে শ্রদ্ধাতে বার বার তাহার মাথা তাঁহার উদ্দেশে নত হইয়াছে, সে কথাও সে জানাইতে ভুলিল না। সর্ব্বোপরি গোপীমোহনের সেবাতে নিজেকে উৎসর্গ করা ছাড়া যে জীবনের আর কোন সার্থকতা নাই বার বার সেই কথাটি শুনাইয়া এক সময়ে সে চুপ করিল।

মহেশ্বরী পাথরের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া সব শুনিতেছিলেন। পারুলের নিজের কথা শেষ হইলে তিনি এখানকার কথা তুলিলেন মন্দির কেমন লাগিল, বৃন্দাবন কেমন মনে হইতেছে ইত্যাদি দু-একটা প্রশ্নও করিলেন। ইহারই উত্তরের ফাঁকে পারুল একবার প্রশ্ন করিল, "ঐ বৈষ্ণবটি কে পিসিমা?"

মহেশ্বরী তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া পারুলের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়িল না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ও আমার একটি ছেলে।"

পারুল এইবার তাঁহারই পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু মহেশ্বরীর চোখে কিছুতে তন্দ্রা নামিল না। তিনি ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া মালাটা আনিয়া বসিলেন।

এ সমস্ত ইতিহাস কোনটাই তাঁহার কাছে নূতন নয়, সুরেনও কতক কতক, লিখিয়াছিল, তা ছাড়া এ ত সমস্তই তাঁহার নিজের বাল্যজীবনের ইতিহাস। তাঁহারও বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবপ্রীতি ছিল অসাধারণ। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কতদিন তিনি বৈরাগীদের ডাকিয়া বিলাইয়া দিয়াছেন। সাধারণ ভিক্ষুকের মুখেও কীর্ত্তন গান শুনিয়া তিনি দিশাহারা হইয়া যাইতেন। আট বৎসর বয়সে কুলগুরুর কাছ হইতে দীক্ষা লইয়া গৃহদেবতার পূজা-অর্চ্চনার যাবতীয় কাজ তিনিও নিজে করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বিবাহে বাধা দেন নাই—তেরো বছর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, ষোল বছরেই বিধবা হন, তবু পুরা তিনটি বছর সময় পাইয়াছিলেন তিনি সংসার করিবার এবং সে সংসার তাঁহার তখন খারাপ লাগে নাই। স্বামীর কথা এখনও আব্ছায়া মনে আছে—আঠারো-উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ তরুণ, বাঁশী বাজাইয়া, গান গাহিয়া, খেলিয়া সময় কাটাইতেন, আর সারারাত্রি কিশোরী বধূর কানে চলিত প্রেম-গুঞ্জন। সে যেন একটা সুদীর্ঘ স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, শাশুড়ী লোক ভাল ছিলেন না, ননদগুলিও নানারকমে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু স্বামীর অসাধারণ পত্নীপ্রেমে যে সবই সহিয়াছিল। তারপর, বিধবা হইবার পর এক বৎসর ধরিয়া নিত্য ঠাকুর ঘরের মাটিতে লুটাইয়া যে কান্নাটা তিনি কাঁদিতেন সে পরলোকের ঠাকুরের বিরহে নয়, ইহলোকের স্বামীর বিচ্ছেদেই—এবং সেই দুর্দ্দান্ত শোক সামলাইতে না পারিয়াই তিনি একদা গুরুর সঙ্গে বৃন্দাবনের পথে পা দিয়াছিলেন।

সে আজ কতকালকার কথা হইয়া গেল। কত যুগ! তাহার পর সে কী আত্মনিপীড়ন এবং কৃচ্ছ্র্সাধনের ইতিহাস তাঁহার এই খ্যাতির পিছনে কতকাল ধরিয়া রচিত হইয়াছে! সে কথা মনে হইলে এখনও যেন অন্তর শিহরিয়া উঠে। তিনি এককালে রূপসী ছিলেন, পারুলের চেয়ে ঢের বেশী রূপসী—সুতরাং তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইবার লোকের অভাব হয় নাই। এখানকার বিভিন্ন মন্দিরের ধনী গোঁসাই-এর দল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার জন্য। তাহাদের মধ্যে কন্দর্পকান্তি তরুণেরও অভাব ছিল না। এবং সেদিন

যে তিনি সেই সহস্র প্রলোভন কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে জগৎস্বামীর প্রীতির চেয়ে সেদিন তাঁহার সেই ইহলৌকিক স্বামীর প্রেমের স্মৃতিই শক্তি যোগাইয়াছিল বেশী। আজ তিনি সুকঠিন তপস্যায় মনকে পরব্রহ্মের পদে কতকটা স্থির করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তখন সেটা তাঁহার কিশোর বয়স, প্রলোভনও ছিল প্রচুর এবং বলবান। তাঁহার চোখের সামনেই কত নিষ্ঠাবতী বিধবার, কত ভেকধারিণী বৈষ্ণবীর পদস্খলন হইতে দেখিয়াছেন তিনি। তাহাদের আগ্রহ, নিষ্ঠা বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম খুব কম ছিল না—তবু, তবু মুহূর্তের মোহই ত যথেষ্ট।······আর তিনিও, তিনিও সহিয়াছিলেন বটে, প্রাণপণে, কঠিনতর কঠোরতর তপস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া এই দেহটাকে ভগবদ্‌-সেবার যোগ্য রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার অন্তরও কি সেদিন ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় নাই? প্রেমের ঠাকুর তাঁহার সেবিকার কত পরীক্ষাই লইয়াছেন—সে সব পরীক্ষার ইতিবৃত্ত আজও শোণিতাক্ষরে বুকের মধ্যে লেখা রহিয়াছে।

অবশ্য সে পরীক্ষার তিনি পুরস্কারও পাইয়াছেন যথেষ্ট। আজ বড় বড় গোঁসাই অপেক্ষা তাঁহাকেই লোকে ভক্তি করে বেশী। শিষ্য এবং ভক্তদের সংখ্যাও তাঁহার কম নাই, একদা যাহা ছিল গোপীমোহনের সামান্য কুটীর আজ সেখানেই উঠিয়াছে বিরাট মন্দির—এ সবই সত্য। শান্তিও তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু সুখ? সে সামান্য তিন বৎসরের ইতিহাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। ভগবদ্‌-প্রীতির আনন্দই সবচেয়ে বড় কি না, আজও সন্দেহ জাগে।

পারুল?

পারুলকে যদি আবার সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করিতে হয় ত সে কি পারিবে নিজেকে বাঁচাইতে?

সেই অন্ধকারে আপন মনেই মহেশ্বরী মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, সে সম্ভব নয়।"

তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন তাঁহার কিশোর স্বামী, পারুলকে কে বাঁচাইবে?

পরের দিন সকালে উঠিয়াই পারুল স্নান করিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, 'তাহ'লে আমি মন্দিরের কী কাজ করব পিসিমা, বলে দিন।"

মহেশ্বরী স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "অত ব্যস্ত কেন মা? সারা জীবনই ত পড়ে রইল।...এখন দু'দিন বিশ্রাম করো।...তা ছাড়া গোপীমোহনের এখনও কোন নির্দেশ পাই নি যে মা—ওঁকে জিজ্ঞাসা করি আগে!'

ঈষৎ ভীত, অভিভূত কণ্ঠে পারুল প্রশ্ন করিল, "উনি কি আপনার সঙ্গে কথা বলেন মা?"

'ওঁর নির্দেশ আসে মা, সে আমি বুঝতে পারি—'

পারুলের দুই চক্ষু অধিকতর আগ্রহে জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু মহেশ্বরীর শান্ত স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের কাছে সব কিছু উচ্ছ্বাসই যেন স্তব্ধ হইয়া যায়—অগত্যা চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। মহেশ্বরীও নিজের জপে-পূজায় মন দিলেন।

সুন্দর সারা সকাল নিজের ঘরের মধ্যেই ছিল। দ্বিপ্রহরের আরতির সময় মহেশ্বরী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে নতমুখে আসিয়া ঘড়িটা তুলিয়া লইলে মহেশ্বরী মৃদুকণ্ঠে সস্নেহ তিরস্কার জানাইলেন, "ছি, বাবা, গোপীমোহনকে অবহেলা।"

আরতির ধূপধুনা-স্তোত্রের মধ্যে মহেশ্বরী ইহাদের অস্তিত্ব ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, শঙ্খের আরতি শেষ করিয়া পূজারী যখন আকাশচারী দর্শকদের উদ্দেশে পানি-শঙ্খ বাহিরের দিকে মেলিয়া ধরিল তখন শুধু একবার তাঁহার চোখে পড়িল, শ্রীরাধার চরণ পদ্ম হইতে পারুলের দৃষ্টি মুহূর্ত্তমাত্রকাল, যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই, একবার সুন্দরের দিকে চাহিয়াই আবার ফিরিয়া গেল। সুন্দরের দৃষ্টিও, মহেশ্বরী বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিলেন, দেবতাদের চরণে নাই, মাটির দিকে নিবদ্ধ।

সন্ধ্যার আরতির সময় মহেশ্বরী আর অন্যমনস্ক হন নাই। তিনি গোপীমোহনের কাছে মনে মনে মার্জ্জনা চাহিয়া দৃষ্টি বরাবরই পারুলের দিকে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পারুল এবেলা সুন্দরের দিকের থাম ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ ইচ্ছা থাকিলেও চোখ যাহাতে সুন্দরকে দেখিতে না পায়। আর সুন্দর দাঁড়াইয়া আছে একেবারে বিগ্রহের দিকে ফিরিয়া—

রাত্রে পারুল মহেশ্বরীকে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিল, "গোপীমোহনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পিসিমা?"

মহেশ্বরী তাঁহার শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি মেলিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর দিলেন, "এখনও করি নি মা, কাল ভোরে করব।"

সেদিনও মহেশ্বরী সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না। এই অল্পবয়সী মেয়েটি এতদিন পরে কী সব এলোমেলো চিন্তা তাঁহার মনে জাগাইয়াছে—অনেক দিনের ভুলিয়া যাওয়া সব কথা—কিছুতেই তিনি যেন কোন কথা স্থির হইয়া ভাবিতে পারিতেছেন না। এমন কি গোপীমোহনের মূর্ত্তিও যেন ধ্যানের সময় কেমন ঝাপসা বোধ হইতেছে!

পরের দিন সকালে তাঁহার জপ শেষ হইলে নীচে না নামিয়া পারুল আর সুন্দরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন তাঁহার পূজার ঘরে। সুন্দর জানিত না যে পারুলকেও ঐ সময়ে ডাকানো হইয়াছে, সে বিস্মিত হইয়া মহেশ্বরীর দিকে চাহিয়া রহিল, আর পারুলের বুকের মধ্যে কোন্ এক অজ্ঞাত আশঙ্কা যেন গুর গুর করিয়া উঠিল।

মহেশ্বরী পারুলের দিকে না চাহিয়া সুন্দরকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাবা সুন্দর, গোটাকতক কথা বলব, মন দিয়ে শোন—"

তাহার পর কয়েক-মুহূর্ত্ত চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিবার পর কহিলেন, "তুমি জানো যে আমার এই ভাইঝি পারুল এখানে এসেছেন তাঁর জীবন এবং দেহ দুই-ই শ্রীরাধা-গোপীমোহনের সেবায় উৎসর্গ করবেন বলে। সেই প্রসঙ্গে আমি আজ ধ্যানে বসে ঠাকুরের কাছে তাঁর আদেশ জানতে চেয়েছিলুম। তিনি এক আশ্চর্য্য আদেশ জানিয়েছেন বাবা সুন্দর—!"

এবার যেন সুন্দরও ভীত হইয়া উঠিল। তাহার শুভ্র ললাটে গোপীচন্দনের তিলকের ফাঁকে ফাঁকে যেন কে সিঁদুর লেপিয়া দিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া একটু পরে মহেশ্বরী কহিলেন, "সে নির্দ্দেশ হ'ল এই যে পারুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে হবে এবং তোমরা দুই বৎসরের জন্য সংসারাশ্রমে ফিরে যাবে

তারপর, যদি তখনও তাঁর পায়ে তোমাদের মতি থাকে ত, তোমরা দুজনেই ফিরে এসে তাঁর সেবার ভার তুলে নেবে তোমাদের হাতে। আর, আর, সেইদিন আমিও পাবো ছুটি—"

শেষের দিকে মহেশ্বরীর কণ্ঠ যেন কাঁপিয়া গেল।···

সুন্দর বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর স্খলিতকণ্ঠে কহিল, "এ যে বড় নির্ম্মম আদেশ মা!"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তাঁর সেবককে তিনি পরীক্ষা ক'রে নিতে চান সুন্দর!"

সুন্দর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই হোক্। তাঁর আদেশ তোমার কণ্ঠ থেকে যখন বেরিয়েছে তখন আর আমার কী বলবার আছে?"

মহেশ্বরীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি নতমুখী পারুলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "গোপীমোহনের আদেশ তুমিও শুনলে মা, এইবার যাও, তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাও।···তার পার্থিব আপত্তিরও কোন কারণ নেই, কারণ সুন্দর শুধু ব্রাহ্মণই নয় আমাদের স্ব-শ্রেণী। শুধু আমি ভাবছি বাবা সুন্দর, এ তাঁর কী লীলা, আর কী পরীক্ষা!"

সুরেনকে আগামী সপ্তাহেই বিবাহের আয়োজন করিতে বলিয়া মহেশ্বরী নীচে নামিয়া আসিলেন। প্রভাতী পূজার কাজ শেষ হইলে পূজারীকে ডাকিয়া তিনি চুপি চুপি কহিলেন, "ভোগ সরলে তুমি ব্যবস্থা ক'রে ওদের খাইয়ে দিও বাবা শোভারাম; আমি আজ আর প্রসাদ পাবো না।'

বিস্মিত কণ্ঠে পূজারী প্রশ্ন করিল, "কেন মা?"

"আজ আমার একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে, এককোটি নাম জপ ক'রে তবে জল খাবো।···সে বোধ হয় রাত্রের আগে শেষ হবে না।"

"প্রায়শ্চিত্ত! তোমার আবার কি অপরাধ হ'ল মা?"

মহেশ্বরী তখন তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, কোন জবাব দিলেন না।

—শেষ—

॥ এই লেখকের ॥

ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
মিলনান্ত
মনে ছিল আশা
রাত্রির তপস্যা
ভাড়াটে বাড়ী
নববধূ
দুর্ঘটনা
ছুটি
আব্ ছায়া
রজনীগন্ধা
রাতমোহানা
পুরুষ ও রমণী
স্বর্ণমুকুর
প্রভাতসূর্য
জ্যোতিষী
মালাচন্দন
কেতকীবন
সীমান্তরেখা
কোলাহল
সমারোহ
কমা ও সেমিকোলন
কাছে আছে যারা
চতুর্দোলা
কঠিন মায়া
স্মরণীয় দিন
কলকাতার কাছেই
বহ্নিবন্যা
শ্রেষ্ঠ গল্প
গল্পসঞ্চয়ন
জন্মেছি এই দেশে
[illegible]